KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. : KLMLGK 200	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLG	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ আষাঢ়, ১৩৬৭ কার্তিক, ১৩৬৭
	Condition: Brittle / Good ✓
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

I.D. Roll No. : KLMLGK

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

অষ্টম বর্ষ ॥ কার্ত্তিক ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

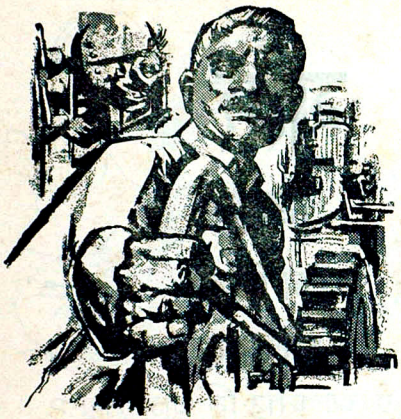

মানুষ ও তার বিশ্বাস

মানুষের সব চেষ্টা, সব সাধনা বাসনার পেছনে রয়েছে
তার এক অন্তর বিশ্বাস—যে বিশ্বাস তাকে বার বার জুগিয়েছে
প্রেরণা, দিয়েছে তাকে দুর্জ্ঞেয় কর্মের শক্তি; পাথরের
কঠিন বুক চিরে মানুষ এঁকেছে পথ, শান্ত জলের নিরব
ধারায় সে জাগিয়েছে বিদ্যুতের প্রাণোচ্ছল।...

এক জাগ্রত বিশ্বাস—যে বিশ্বাস সংসারে এনেছে সুখের
আনন্দ, মানুষকে দিয়েছে আরও বৃহত্তর কর্ম্মের সুযোগ, জীবনকে
করেছে অর্থবর্ম্মে সত্যতে প্রতিষ্ঠিত।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের
সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন সুস্থ ও সুখী করে
রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের
চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে
বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের
নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও...দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR 6-X52 BG

অষ্টম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা **সমকালীন** কার্তিক ১৩৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গদেবতা-পূজন। অমিয়নাথ সান্যাল ৪২৫

রুডলফ্ রথ্। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪৩৩

জমিদার দ্বারকানাথ। অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৪৩৬

কেরীসাহেব ও বহুভাষা-কোষ। অজিত দাস ৪৪১

গণিতের দর্পণে মিশর। মুরারি ঘোষ ৪৫১

শতাব্দীর ঋণ ও দায়িত্ব। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৪৫৫

রবীন্দ্র-রচনাসূচী। পুলিনবিহারী সেন ও পার্থ বসু ৪৫৯

ভগবানের জন্ম। সোমেন বসু ৪৬৩

'শিশিরকুমার ভাদুড়ী'। রবি মিত্র ৪৬৬

সমালোচনা—অজিতকৃষ্ণ বসু ৪৬৮

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

মেট্রিক ওজন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক

১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর থেকে নিম্নলিখিত এলাকাগুলিতে সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মেট্রিক ওজন ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়েছে। ব্যবসার জন্য ব্যবহারকল্পে সমস্ত মেট্রিক বাটখারায় ওজন ও পরিমাপ কর্তৃপক্ষের মোহর থাকা চাই। অন্য কোন রকম বাটখারা ব্যবহার করা বে-আইনী হবে।

অন্ধ্র প্রদেশ : বিশাখাপটনম, কৃষ্ণা, গুনেটুর, কুরনুল, হায়দ্রাবাদ, ওয়ারাঙ্গল, নিজামাবাদ জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

আসাম : নওগাঁ জেলা এবং গৌহাটি শহর।

বিহার : ভাগলপুর ও রাঁচি ডিভিসন এবং পাটনা ও হিজুত ডিভিসনের পৌর ও নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ।

গুজরাট : আমেদাবাদ, রাজকোট ও বরোদা শহরসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

কেরালা : কোজিকোড, এরনাকুলাম এবং কুইলন জেলাসমূহ।

মধ্যপ্রদেশ : সেহোর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র, এবং জব্বলপুর জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

মাদ্রাজ : মাদ্রাজ, চিংগেলপুট, দক্ষিণ আরকট, উত্তর আরকট জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

মহারাষ্ট্র : বোম্বাই, পুণা, নাগপুর, ঔরঙ্গাবাদ, শোলপুর, কোলহাপুর, আকোলা, অমরাবতী, ওয়ার্ধা, ইওমল শহরসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

মহীশূর : বাঙ্গালোর, রাইচুর, ধারওয়ার জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

উড়িষ্যা : ব্রহ্মপুর, কটক এবং সম্বলপুর শহরসমূহ।

পাঞ্জাব : অমৃতসর, লুধিয়ানা, আম্বালা, পাতিয়ালা, গুরগাঁও জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

রাজস্থান : আজমীর, বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, কোটা ও উদয়পুর জেলাসমূহ।

উত্তরপ্রদেশ : মীরাট, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, মোরাদাবাদ' বারাণসী, কানপুর, ঝান্সি, এলাহাবাদ ও গোরখপুর শহরসমূহ।

পশ্চিম বাঙলা : কলকাতা ও হাওড়ার পৌর এলাকাসমূহ।

দিল্লী : দিল্লীর সমস্ত এলাকা।

হিমাচল প্রদেশ : মণ্ডী ও সিরমুর জেলাসমূহ।

মণিপুর : ইম্ফল।

ত্রিপুরা : আগরতলা শহর।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ : পোর্ট ব্লেয়ার শহর।

পণ্ডিচেরি : পণ্ডিচেরির সমস্ত এলাকা।

★

নিম্নলিখিত শিল্প ও ব্যবসার লেনদেনে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক :

পাট, সুতী বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, ভারী রসায়ন, সিমেন্ট, লবণ, কাগজ, রিফ্রেক্টরিজ' অলৌহ ধাতু, রবার শিল্প, বনস্পতি, সাবান,পশমী দ্রব্য, তুলার অগ্রিম বিক্রয় বাজার এবং কফি বোর্ডের লেনদেনের ক্ষেত্রে।

মে ট্রি ক প দ্ধ তি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

DA. 60/409

অষ্টম বর্ষ। সপ্তম সংখ্যা কার্ত্তিক তেরশ' সাতষট্টি

নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গদেবতা-পূজন

অমিয়নাথ সান্যাল

নাট্যশাস্ত্রে ৩য় অধ্যায় আদ্যোপান্ত রঙ্গ দেবতাগণের পূজানিধি সংক্রান্ত উপদেশাবলী রূপে রচিত। সর্বশেষ শ্লোক (১০৪ শ্লোক) যথা—

এবমেব বিধি দৃষ্টো রঙ্গ দৈবতপূজনে।
নবে নাট্য গৃহে কার্যং প্রেক্ষায়াং তু প্রযোক্তৃভিঃ ॥

অর্থাৎ—রঙ্গ দেবতা (নাট্য গৃহের ও নাট্যপ্রয়োগের শুভাশুভকারী দেবতাগণের) পূজা সম্বন্ধে উক্ত বিধি উপদেশ করা হয়েছে। একমাত্র নূতন (সদ্যোনির্মিত) নাট্যগৃহে প্রেক্ষণব্যাপার পক্ষে* প্রযোক্তৃবৃন্দ এই কার্য নিষ্পাদিত করবেন।

মোটের উপর ধারণা এই যে, নূতন কিছু করতে হলে প্রারম্ভে দেবতাগণের তুষ্টিবিধান করতে হবে। দেবতারা তুষ্ট হলে, অন্তত পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক কার্যে বিঘ্ন ঘটবে না। দেবতারা স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ * কিন্তু শুভাশুভ ফল প্রত্যক্ষ এ রকম সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল।

অধ্যায়ের শেষ পনেরোটি শ্লোক সম্প্রতি আলোচ্য। বিচিত্র কৌতুকাবহ উপদেশের অন্তরে একটি অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ধার করা যায়।

অধ্যায়ারম্ভ থেকে ৮৯ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে দেবতাগণের উদ্দেশে আবহনাদি বহু মন্ত্র দ্বারা পুরস্কৃত পূজা বলি হোম কার্য বিহিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩ শ্লোকে রঙ্গ মধ্যে পর্ণমালা পুরস্কৃত ও সলিলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপনার কথা আছে, এবং বলা হয়েছে যে "সুবর্ণং চাত্র দাপয়েৎ"। অর্থাৎ—পূজাকারী নাট্যাচার্য সভাস্থ নৃপতি নর্তকী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে ঐ কুম্ভের মধ্যে সুবর্ণ-দান কার্যে প্ররোচিত করবেন। কুম্ভটি তখন হল স্বর্ণগর্ভ। পরে নৃপতি ও নর্তকীগণের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন, আশীর্বাচন, তথা নাট্যসিদ্ধি নিমিত্ত প্রার্থনাও বিহিত হয়েছে। এই রূপে নৃপতি নাট্যস্বামী ইতি আখ্যা লাভ করেন।

অতঃপর, ৯০ শ্লোকে একটি অপ্রত্যাশিত উপদেশ-পর্ব আরম্ভ হয়েছে.—

হোমং কৃত্বা যথান্যায়ং হবির্মন্ত্রপুরস্কৃতম্।
ভিন্দ্যাৎ কুম্ভং ততশ্চৈব নাট্যাচার্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ৯০॥ ৩অঃ।

অর্থাৎ—যথাবিহিত হবির্দান-মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পুরস্কৃত হোম কার্য সাধনের পরেই

নাট্যাচার্য প্রযত্নপূর্বক (প্রতিষ্ঠিত) কুম্ভটি বিদীর্ণ করবেন।

"প্রযত্নতঃ" অর্থাৎ—কুম্ভটি বিদীর্ণ করতেই হবে। নাট্যাচার্যই এই কার্যটি করবেন; অন্য কেউ নয়। অতঃপর —

অভিন্নে তু ভবেৎ কুম্ভে স্বামিনঃ শত্রুতো ভয়ম্।
ভিন্নে চৈব তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বামিনঃ শত্রুসংক্ষয়ঃ ॥ ৯১ ॥ ঐ।

অর্থাৎ—কুম্ভ অবিদীর্ণ থাকলে নাট্যস্বামীর (নৃপতির) পক্ষে শত্রুভয় উপস্থিত হয়। কুম্ভটি বিদীর্ণ হলে জানতে হবে স্বামিব্যক্তির শত্রুগণেরও সম্যক ক্ষয় হবে।

ফল কথা—সেই জলপূর্ণ, পর্ণমালাপরিস্কৃত, স্বর্ণগর্ভ কুম্ভটি বিদীর্ণ করে উপস্থিত নাট্যস্বামী, নর্ত্তকী ও অপর সকলকে জানিয়ে দিতে হবে যে নৃপতির শত্রুপক্ষ এই ভগ্নকুম্ভের অবস্থা প্রাপ্ত হবে। উপস্থিত গুপ্তশত্রুরাও সেকথা জানলেন।

প্রশ্ন এই যে নাট্য স্বামীকে ভয়মুক্ত করার এই চেষ্টা কি হেতু? উত্তরে বলা যায়—নাট্য-স্বামীর কল্যাণেই নাট্যের কল্যাণ, তথা নাট্যাচার্যের ও নটবর্গের অব্যাহত জীবিকা-সংস্থান নির্বাহিত হবে। শত্রুনাশ হক বা না হোক, এবং শত্রুবর্গের মনে বিনাশভয়ও উজ্জীবিত হবে। নাট্যাচার্যত অকৃতজ্ঞ পুরুষ নন।

তথাপি প্রশ্ন হবে, বেচারা কুম্ভটি কি দোষ করল?

উত্তরে বলা যায়—কুম্ভের মধ্যেই দোষ আছে। কিরূপ? 'কুম্ভ' শব্দের একটি অর্থ হল, বেশ্যার গর্ভজাত পুত্র, অন্য অর্থ হল বেশ্যার উপপতি। রাজপোষিতা নর্তকী বা বেশ্যা চিরকাল রাজশত্রুসম্ভবকারিণী রূপে সর্বজনবিদিত। স্বামী বা রাজার গুপ্ত শত্রুভয় ঐ কুম্ভরূপী শত্রু-বর্গের দিক থেকে উপস্থিত হওয়া সম্ভব। আপাতত, কুম্ভটি স্বর্ণগর্ভ, সসলীল ও পর্ণমালা-শোভিত হলেও তাকে বিদীর্ণ* করে নর্তকীবৃন্দকে ও গুপ্তশত্রুকে জানিয়ে দিতে হবে, রাজ-দ্রোহিতার ফল অতীব ভয়ানক।

প্রশ্ন হতে পারে, নাট্যাচার্য যদি কুম্ভটি বিদীর্ণ না করেন, তা হলে বিধির অপালন কি নিতান্ত দোষণীয়? উত্তরে বলা যায়—অতীব দোষণীয়। অর্থাৎ সভাস্থ সকলেই মনে করবেন, ঐ কুম্ভটির প্রতি নাট্যাচার্যের সহেতুকী মায়া আছে; বা স্বার্থ দৃষ্টি আছে; নাট্যাচার্যের পক্ষে সেই মায়াটি ত্যাগ করাই ভাল; নচেৎ রাজরোষে পতিত হয়ে প্রাণ হারাবেন! এবং—কুম্ভ বিদীর্ণ হলেও গর্ভস্থ সুবর্ণ ত নাট্যাচার্যই লাভ করেন। সুতরাং—বিদীর্ণ করা একটি সংকেত মাত্র, যথা "পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার প্রাণে বাজে"।

প্রসঙ্গত, এই অধ্যায়ের উপদেশাবলীর মধ্যে সূত্রধার-পুরুষের (যাঁর সম্বন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে সর্বপ্রথম উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'পুণ্যাভিধান' অর্থাৎ পুণ্য-নামা পুরুষ) উল্লেখই নেই। অথচ ৩৬ অধ্যায়ে প্রশ্নব্যপদেশে মুনিরা সূত্রধারকেই (আচার্যকে নয়) উল্লেখ করে বলেছেন

* এস্থলে 'প্রেক্ষা' অর্থাৎ পূর্বরঙ্গ-বিধান অনুযায়ী প্রেক্ষা (প্রকৃষ্ট রূপে ঈক্ষণ, পরীক্ষা)।

* আজকের দিনেও নূতন গৃহ নির্মাণের পূর্বে থেকেই মিউনিসিপালিটির জাগ্রত দেবতাগণের সানুগ্রহ অনুমতি প্রয়োজন হয়; তেমন তেমন দেবতা হলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তোষণেরও প্রয়োজন হয়। আধুনিক দেবতা ভোটদাতাগণের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তৈরী হয়। যাই হক—হুকা হুকাই আছে, কেবল খোল আর নলচে বদলে গিয়েছে। দেবতা-তান্ত্রিক খোল নলচের বদলে এখন গণ-তান্ত্রিক খোল আর নলচে। পূর্বে ছিল দেবতাগণ; এখন গণ-দেবতা।

"সূত্রধার পুরুষ এত শৌচাচারসম্পন্ন হয়ে শ্রৌত উপদেশের চর্চা করেন কি হেতু?" ৩৬ অধ্যায়ে—আচার্যের প্রাধান্য সূচিত নয়। এই ব্যতিক্রমের হেতু কি?

মীমাংসা কল্পে বলা যায়—৩৬ অধ্যায় সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির অংশটি প্রাচীনতর, অর্থাৎ মাধ্যমিক সম্পাদনা থেকে প্রাচীনতর। সেই সময় পর্যন্ত নাট্যকার্যে সূত্রধারেরই প্রাধান্য ছিল, আচার্যের নয়। পরে, যে কালে মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গের হাতে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়েছিল, যে কালে সূত্রধার-আচার্য সংহতি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং—রঙ্গদেবতপূজন কর্ম একান্তত নাট্যাচার্যের আচরণীয় হয়ে পড়েছিল। অতঃপর, পরবর্তী শ্লোকদ্বয়—

ভিন্নে কুম্ভে ততশ্চৈব নাট্যাচার্যোঽ প্যুপেতভীঃ।
প্রগৃহ্য দীপিকাং দীপ্তাং সর্বং রঙ্গং প্রদীপয়েৎ ॥ ৯২ ॥ ঐ।
ক্ষেড়িতৈঃ স্ফোটিতৈশ্চৈব বল্গিতৈশ্চ প্রধাবিতৈঃ।
রঙ্গমধ্যে তু তাং দীপ্তাং সশব্দং সম্প্রযোজয়েৎ ॥ ৯৩ ॥ ঐ।

অর্থাৎ। অনন্তর কুম্ভ বিদীর্ণ হলে নাট্যাচার্য বিগতভয় হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসমেত দীপবর্তি (ক্ষুদ্র মশাল) গ্রহণ করে সমগ্র রঙ্গপীঠ আলোকোজ্জ্বল করবেন।

এবং, সিংহনাদের ন্যায় আস্ফালন ও চিৎকার শব্দ করতে করতে, তথা লম্ফ-ঝম্প দ্বারা বেগে ইতস্তত ধাবমান হয়ে সেই জ্বলন্ত দীপবর্তি রঙ্গপীঠের মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট করবেন।

পরবর্তী শ্লোকদ্বয় যথা—

শঙ্খদন্দুভিনির্ঘোষৈ র্মৃদঙ্গপণবৈস্তথা।
সর্বাতোদ্যৈঃ প্রবাদিতৈঃ রঙ্গো যুধ্যানি কারয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ঐ
তত্র ভিন্নং চ ছিন্নং চ দারিতং চ সশোণিতম্।
অন্তঃপ্রদীপ্তমায়ত্তং নিমিত্তং সিদ্ধিলক্ষণম ॥ ৯৫ ॥ ঐ।

অর্থাৎ—(দীপবর্তি বিনিবেশের পরে) শঙ্খ-দন্দুভি নির্ঘোষ তথা, মৃদঙ্গপণবসকলের এবং অপর সর্ব আতোদ্য সকলের প্রবাদন সহকারে রঙ্গমধ্যে বহুপ্রকার ছল-যুদ্ধ নিষ্পাদিত করা উচিত ॥ ৯৪ ॥

এইরূপে (যুদ্ধ নিবন্ধন রঙ্গস্থিত উপকরণের) খণ্ডন, ছেদন, বিদারণ ও শোণিতরঞ্জন হলে তথা আয়ত্তাধীন (বুঝতে হবে) পূজনকর্মসিদ্ধির নিমিত্ত লক্ষণ আবির্ভূত হয়েছে ॥ ৯৫ ॥

"সশোণিতম্ অর্থাৎ—পূর্বে পশুবধ করে বলিদান করা হয়েছে। সেই পশুবধাবশিষ্ট রক্ত প্রতিসেচন দ্বারা রঙ্গস্থানকে রঞ্জিত করা।

৯৪ শ্লোকে, নির্ঘোষাদি তিন পর্যায়ের তাৎপর্য এই যে শঙ্খদন্দুভি দ্বারা যুদ্ধের পূর্বসংকেত, মৃদঙ্গ-পণবের সম্মিলিত তিনটির প্রবাদন দ্বারা যুদ্ধারম্ভ, এবং শঙ্খাদি যাবতীয় আতোদ্যের যুগপৎ প্রবাদন দ্বারা যুদ্ধ কর্ম নিষ্পাদন।

"ক্ষতপ্রদীপ্তম আয়ত্তং" ইতি। কোথাও ক্ষত, কোথাও বা বহ্নিমান; তথাপি সমগ্র ব্যাপার আয়ত্তাধীন। পরবর্তী শ্লোক দ্বয়—

সম্যগিষ্টস্তু রঙ্গো বৈ স্বামিনঃ শুভমাবহেৎ।
পুরস্য বালবৃদ্ধস্য তথা জনপদস্য চ ॥ ৯৬ ॥ ঐ
দুরিষ্টস্তু তথা রঙ্গো দৈবতৈ র্দুরধিষ্ঠিতঃ।

* বাংলা দেশে প্রচলিত প্রবাদ "হাটের মাঝে হাড়িভাঙ্গা" সম্ভবত এই ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।

নাট্যবিধ্বংসনং কুর্যাৎ নৃপস্য চ তথাশুভম্ ॥ ৯৭॥ ঐ

অর্থাৎ—রঙ্গপীঠ সম্যক রূপে ইষ্টসাধিত হলে স্বামী পুরুষের শুভ আবহন করে, তথা, পুর, বালক-বৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের এবং জনপদেরও (শুভ আবহন করে) ॥ ৯৬ ॥

কিন্তু—রঙ্গপীঠ দুরিষ্টসাধিত হলে, তথা দেবতাগণ কর্তৃক ব্যতিক্রমসহকারে অধিষ্ঠিত হলে নাট্যের (ভবিষ্যৎ নাট্যকর্মের) বিধ্বংসন করে, এবং নৃপতির অশুভ ঘটায় ॥৯৭॥

'সম্যক্ ইষ্ট' অর্থাৎ দেবপূজাদি থেকে সর্বশেষ যুদ্ধসাধন পর্যন্ত ইষ্টকর্ম।

'দুরিষ্ট' অর্থাৎ—অপূর্ণ অথবা বিধিবিরুদ্ধ ভাবে ইষ্টকর্ম সাধন। 'দুরধিষ্ঠিতা' অর্থাৎ দেবতাগণের অনিশ্চিত অধিষ্ঠান।

মন্তব্য। এই শ্লোকদ্বয় দ্বারা সাংস্কারিক আশ্বাস ও ভয় দেখান হয়েছে মাত্র। তবে,—নৃপতি ও নাট্য, এদের একের অমঙ্গলে উভয়েরই অমঙ্গল এই সংবাদটি স্পষ্ট।

পরবর্তী শ্লোক যথা—

যদ্যেবং বিধিমুৎসৃজ্য যথেষ্টং সম্প্রযোজয়েৎ।

প্রাপ্নোত্যপচয়ং শীঘ্রং তির্যগ যোনিংচ গচ্ছতি ॥ ৯৮ ॥ ঐ

অর্থ। যে (নাট্যাচার্য) এই সমগ্র বিধি ত্যাগ করে, ইষ্টপূজন মাত্র প্রয়োগ করেন, তিনি শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হন এবং (মৃত্যুর পর) তির্যগযোনিতে জন্মলাভ করেন।

মন্তব্য। এও সাংস্কারিক ভয়ের উদ্বোধন মাত্র। তির্যগ্ অর্থাৎ কুটিল। বক্র বা কুটিল পথে গমন করলে স্বস্থানে ফিরে আসা দুর্ঘট। তির্যগ্ যোনি অর্থ পশুপক্ষিপ্রভৃতির যোনিতে আত্মার গমন; সেরূপ অবস্থা থেকে পুনরায় মনুষ্য যোনিতে আসা দুর্ঘট মনে করা হত। যদি বলা যায়, মনুষ্যযোনিতে অবস্থান কালেও ত' দুঃখ থেকে পরিত্রাণ নেই, সুতরাং সরল বা তির্যগ্ সব যোনিই সমান, তদুত্তরে সিদ্ধান্তীরা বলেন—সপ্তম শ্রেণীতে পাঠকারী বালক ও বলতে পারে, অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে কি লাভ! তখনও ত' লিখন-পঠনের সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হবে! মনুষ্য যোনি বুদ্ধি প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠ। জীবমাত্রই শ্রেয়কে লাভ করতে ইচ্ছা করে। তির্যগ যোনিস্থ জীবের বুদ্ধি কম বলে আত্মোন্নতি করতে পারে না। মনুষ্য যোনি আত্মোন্নতি করতে সক্ষম। অতএব—মনুষ্য যোনিতে লাভের আশা অধিকতর। পরবর্তী শ্লোক—

যজ্ঞেন সম্মিতং হ্যেতদ্ রঙ্গদৈবতপূজনম্।

অপূজয়িত্বা রঙ্গং তু নৈব প্রেক্ষ্যং প্রযোজয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

অর্থ। এই রঙ্গদেবতা পূজন কর্ম যজ্ঞের (বৈদিক যজ্ঞের) তুল্য। রঙ্গের পূজা না করে প্রেক্ষা * প্রয়োগ করা উচিত নয়।

মন্তব্য। ১ম অধ্যায়ের ১১৯ থেকে ১২৬ শ্লোকে এরূপ উপদেশের মূল ধ্বনি পাওয়া যায়। নাট্য বেদকে বেদরূপে স্বীকার করলে এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট। অন্য বেদীয় যজ্ঞ যেমন দৃষ্টাদৃষ্টফল প্রসব করে, রঙ্গদেবতা পূজন ও তদ্রূপ দৃষ্টাদৃষ্টফল প্রসব করে। অতএব—উভয়ই তুল্যমূল্য। পরবর্তী শ্লোক—

পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যেতে মানিতাঃ মানয়ন্তি চ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কর্তব্যং রঙ্গপূজনম্ ॥ ১০০ ॥

অর্থ। (৩য় অধ্যায়ে উল্লিখিত) এই (দেববর্গ) পূজিত হলে ও সম্মানিত হলে এঁরা পূজা-সম্মানকারী নাট্যাচার্যকে (নাট্য সমাজে) পূজার্হ (ও লোকসমাজে) সম্মানার্হ করেন।

* প্রেক্ষা অর্থ পূর্বরঙ্গে প্রেক্ষা।

অতএব সর্বপ্রযত্ন সহকারে রঙ্গদেবতাগণের পূজন কর্তব্য।

তাৎপর্য। স্পষ্ট। যিনি পূজা করেন, তিনিই আবার পূজিত হন। যিনি দেবতা (অথবা মানুষকে) সম্মান করেন, তিনি সম্মান লাভ করেন। আধুনিক কালে দেব-পূজা অপেক্ষা মানুষ-পূজাই প্রধান হয়েছে। তা' হ'ক। কিন্তু, উক্তিটি সত্য বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষে দেবত্ব আরোপ করে পূজা-সম্মান করা হচ্ছে। আবার, মানুষকে মহামানব রূপেও পূজা-সম্মান করা হচ্ছে। যাই হ'ক—পূজা-সম্মান আছে, ও থাকবে। এবং প্রত্যক্ষ দেখা যায় পূজাকারী স্বয়ং পূজিত হ'ন,সম্মানকারী স্বয়ং সম্মানিত হ'ন। পরবর্তী শ্লোক—

ন তথাশু দহত্যগ্নিঃ প্রভঞ্জনসমীরিতঃ।

যথা হ্যপ্রয়োগস্তু প্রযুক্তো দহতি ক্ষণাৎ ॥ ১০১ ॥

অর্থ। অপপ্রয়োগ (অবহেলাদি নিবন্ধন নিকৃষ্ট দেবতা (পূজন) আচরিত হলে যেমন তৎক্ষণাৎ (প্রযুক্তে)দগ্ধ (বিনষ্ট) করে, ততশীঘ্র বায়ুবেগচালিত অগ্নিও দহন ঘটাতে পারে না।

তাৎপর্য। এই শ্লোক অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তি রূপে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। বায়ু দ্বারা চালিত বা সম্বলিত না হ'লে অগ্নি (ডিনামাইট বা হাইড্রোজেন বোমার কথা হচ্ছে না) শীঘ্রই ব্যাপক ভাবে দহন ঘটায় না। অর্থাৎ—অগ্নি বায়ুর সাহায্য অপেক্ষা করে। কিন্তু—অপপ্রয়োগ ক্ষুদ্রতম হ'লেও স্বকীয় দুষ্টোন্ত প্রভাবে ও সর্বপরসহায় নিরপেক্ষ ভাবে তৎক্ষণাৎ সর্বপ্রযত্নের মূলীভূত মানসিক শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সম্ভারকে ভস্মীভূত করে। "ওটা যখন করা হল না, তখন এটাকে বাদ দিলেই বা ক্ষতি কি?" ইত্যাকার ত্বরিত মনন-ক্রিয়া অগ্নি-কর্ম থেকেও বেগবান, এবং তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রূপ মানস-নৈবেদ্যকে ভস্মীভূত করে। ফলে—অবশিষ্ট প্রয়োগ "ভস্মে ঘী ঢালা" হয়ে পড়ে।

বলাই বাহুল্য, **যাবতীয় বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এই উক্তি সত্য।** "যা হয় একটা হয়ে ত' যাক্" ইতি শিথিল মতবাদ বা কর্মচেষ্টা কি পরিমাণ অভীপ্সিত ফল প্রসব করে, বিবেচনা করার যোগ্য বিষয়। অবশ্য, যে অনুষ্ঠান কোনও বিধির অপেক্ষিত নয়, তার সঙ্গে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসেরও নিত্য সম্বন্ধ নেই। **এক্ষেত্রে দেবতা-পূজনই প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হ'ল—অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-বিশ্বাস।** অনুষ্ঠান যদি কুসংস্কার গণ্য হয়, তা হ'লে সমূলে ত্যাগ করাই ভাল। কিন্তু—'আধা-খাপচা' অনুষ্ঠান মনেরই ক্ষতি-কারক। যেখানে বিধিপূর্বক প্রয়োগ একেবারেই বর্জিত, সে স্থলে প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ফল-পার্থক্যের কথা ওঠে না। কিন্তু বিধি থাকলে অপপ্রয়োগ হ'লে ফলের চিন্তা হ'তে বাধ্য। যথা—বৎসরান্তে রাস্তা-ঘাটে ঘেরা-টোপ খাটিয়ে বারো-ইয়ারি পূজা অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসরই যে চাঁদার টাকা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মদ সিগারেট বা মোদকের খরচ উঠবে বা সমপরিমাণে লাভ হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। শ্রদ্ধা একবার অন্তর্হিত হ'লে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা দুষ্কর। পুনশ্চ—অক্ষমতা জন্যও অপপ্রয়োগ ঘটতে পারে। তাতে শ্রদ্ধার হানি হয় না। কিন্তু—"পূজোটা যা হয় একটা হয়ে যাক্, কিন্তু—থেমটা—নাচ গানটা যথাযোগ্য হ'ক" ইতি অপপ্রয়োগ শ্রদ্ধাকেই ভস্মীভূত করে।

পরবর্তী শ্লোক—

শাস্ত্রজ্ঞেন বিনীতেন শুচিনা দীক্ষিতেন চ।

নাট্যাচার্যেণ শান্তেন কর্তব্যং রঙ্গপূজনম্ ॥ ১০১ ॥

অর্থ। শাস্ত্রজ্ঞ, বিনীত, শুচিমান, দীক্ষিত ও ধীরবুদ্ধি নাট্যাচার্য দ্বারা রঙ্গপূজন কর্তব্য।

মন্তব্য। ৩৫শ অধ্যায়ে আচার্য-লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'নাট্যাচার্য' ইতি উপাধি

নেই। ৩৬ অধ্যায়ে মাত্র একস্থানে 'আচার্য' শব্দের উল্লেখ আছে। অথচ, এই এক ৩য় অধ্যায়ে "নাট্যাচার্য" শব্দ চারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

ভরতের তিরোভাবের পরে, **কিছুকাল পর্যন্ত** সূত্রধারই প্রধান পুরুষ ছিলেন এবং শৌচপরায়ণ ও শ্রুতিবাক্য তৎপর হয়ে রঙ্গপূজন করতেন। এই হেতুতেই—৩৬ অধ্যায়ে বর্ণিত (১২, ১৩ শ্লোক) মুনিগণের জিজ্ঞাসা-বুদ্ধিতে সূত্রধার পুরুষের শৌচপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ-সকল আরূঢ় ছিল।

কিন্তু—এরও পরবর্তীকালে, সূত্রধার-প্রণালী নিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মনে করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ রঙ্গপূজনের কর্ণধার হলেন, সূত্রধার নয়, আচার্যও নয়, কিন্তু নাট্যাচার্য। এই সময়ে, রঙ্গপূজন-বিধি বিষয়ক ও পাণ্ডুলিপিগত যে রচনা মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ পেয়েছিলেন, সেই রচনাই আমরা নাট্যশাস্ত্রাখ্য গ্রন্থে ৩য় অধ্যায় রূপে সাক্ষাৎ করছি।

শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু 'দীক্ষিতেন' শব্দটির তাৎপর্য আছে। দীক্ষা ব্যতীত মন্ত্র-হোম কর্মে অধিকারই হয় না। আদ্যোপান্ত উপদেশের মূল লক্ষ্য হলেন নাট্যাচার্য, যিনি সম্যক রূপ প্রয়োগ সাধিত করবেন। **সুতরাং বলাই হয়ে গেল যে নাট্যাচার্য মাত্রই দীক্ষিত**; অথবা—যে নাট্যাচার্য দীক্ষিত সেই নাট্যাচার্যই মন্ত্র-হোমাদি দ্বারা রঙ্গপূজন করেন। অদীক্ষিত নাট্যাচার্যের রঙ্গপূজন কর্মে অধিকার থাকতেই পারে না। সুতরাং —এই শ্লোকে "নাট্যাচার্য দীক্ষিত হবেন" এরূপ উপদেশ করা, আর "আচার্য উপবীত ধারী হবেন" উপদেশ করা উভয়ই অকারণ গৌরব।

তর্ক বা সংশয় হতে পারে, যথা—ভরত মুনির বর্তমানতার কালে হয়ত 'রঙ্গপূজন' ব্যাপারই ছিল না, সুতরাং দীক্ষা-অদীক্ষার প্রশ্ন ছিল না। পরে, রঙ্গ-পূজন কর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল বলে দীক্ষার কথা উঠেছে। এ সময়ে হয়ত বহু নাট্যাচার্য ছিলেন; নাট্য সার্ববর্ণিক মনে করা হয়েছিল, কারণ নাট্যবেদই সার্ববর্ণিক (১ম অঃ ১২ শ্লোক "তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্")। সুতরাং শূদ্রবর্ণের নাট্যাচার্য হতেও বাধা নেই। অতঃপর—পরবর্তীকালে রঙ্গপূজন প্রবর্তিত হলে—"শূদ্র জাতীয় নাট্যাচার্যের রঙ্গপূজন কর্মে অধিকার নেই" এই কথা-টাই প্রকারান্তরে বলা হল যে নাট্যাচার্য দীক্ষিত ব্যক্তি হবেন।

এরূপ তর্ক যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ—সংগ্রহ-শাস্ত্রেরই মধ্যে ৩২ অধ্যায়ে ৪৫১ শ্লোকে আছে— "দৈবপূজাধিকারশ্চ তত্র সম্পরিকীর্তিতঃ"। সুতরাং—ভরত মুনির কালে ও সংগ্রহশাস্ত্র রচনার কালেও দেবতাপূজনকর্ম উপদিষ্ট হয়েছিল।

তর্ক ত্যাগ করে, অন্য রূপ মীমাংসা সম্ভব।

সুপ্রাচীন কাল থেকে যেমন বেদমূলক দীক্ষা ছিল, তদ্রূপ পুরাণমূলক দীক্ষাও ছিল। পৌরাণিক ধর্ম তথা দেব-দেবতার উপাসনা-পদ্ধতি বৈদিক ধর্ম-কর্ম থেকে পৃথক ও প্রাচীনতর। 'শিব' বা 'মহাদেব' নামে উপাস্য দেবতাবিশেষ মূলে পৌরাণিক ধর্মেরই কীলকস্বরূপ ছিলেন। শিব বা মহাদেবের চরিত্রের সঙ্গে গান্ধর্ব, বিশেষত, নৃত্ত ও বাদ্য এতই ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত যে নাট্য-গান্ধর্বের সম্মিলিত ঐতিহ্য এই দেবাদিদেবকে রঙ্গপূজন অধ্যায়ে দেব-নামাবলীর মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে ছিল (৩য় অধ্যায়—৪ শ্লোক "নমস্কৃত্য মহাদেবং সর্বলোকে শ্বরং ভবম্ ।। ইত্যাদি") এই অগ্র আসনে কোনোও কালেই কোনও বৈদিক দেব-দেবতা স্থানলাভ করেননি। পুনশ্চ—শৃঙ্গারাদি রস-পরিভাষার কেন্দ্রস্থ বিগ্রহ বা নাভিস্বরূপে কৈলাস-শৃঙ্গবিহারী শিবই ছিলেন আদ্যতম উপাস্য ব্যক্তি। **পুনশ্চ**—নাট্যশাস্ত্রের ৫ অধ্যায়ে পূর্বরঙ্গবিধানের শেষের দিকে পাঁচটি শিব-স্তোত্র গেয়-পদ রূপে উপদিষ্ট হয়েছে।

এক কথায় 'নাট্যশাস্ত্র' আদ্যোপান্ত শিব-কেন্দ্রিক ব্যাপার। এই শিব অর্থে কল্যাণ বা

মঙ্গল নয়। শিব বা মহাদেব প্রধানতম উপাস্য দেবতা গণ্য হয়েছিলেন। অবশ্যই, বিশিষ্ট প্রকার দীক্ষাগ্রহণের তথা পূজাদি কর্মের পদ্ধতি ছিল।

ভরতেরও পূর্বকাল থেকে সূত্রধারপুরুষ পদাভিষিক্ত হওয়ার পূর্বেই শৈবোপসনামূলক দীক্ষা গ্রহণ করতেন। সমাজে তিনি যে বর্ণাশ্রিতই হন, নাট্য সংসদে এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি শিবোপাসক হতে বাধ্য। অতএব—'রঙ্গদেবতাপূজন' বিষয়ক উপদেশের মধ্যে দীক্ষা-গ্রহণসূচক উপদেশের স্থানই নেই।

কিন্তু—পরবর্তীকালে যখন নাট্যাচার্যের উপরে রঙ্গপূজনের দায়িত্ব বর্তিত হয়েছিল তখন নূতন করে দীক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। নাট্যাচার্য হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে বেদমূলক দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে আচার্য দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে তিনি পূর্ব দীক্ষা ত্যাগ করে, অভিনব দীক্ষা গ্রহণ করতেন। কি হেতু?

হেতু এই যে—দুই নৌকায় পা' দেওয়াটা ভাল কাজ নয়। দুটি মূলত পৃথক ধর্মাচরণ-পদ্ধতির উপর কখনও সমান শ্রদ্ধাবিশ্বাস থাকতে পারে না। তখনও উপাসনা মূলক ধর্মের মধ্যে সমীকরণ (ইং ইকলেকটিসিজম) বা নববিধান দেখা দেয়নি। সমীকরণ যথা—শিব ও যা, কালীও তা', নির্গুণব্রহ্মও তাই, ঘন্টাকর্ণও তাই মনসাও তাই, বিষ্ণুও তাই কৃষ্ণ ও তাই শ্রীরাধা ও তাই, শ্রীগুরু ও তাই,—ইত্যাকার ধর্মীয় "ফ্রুট-স্যালাড্" বা 'জগা-খিচুড়ি'।

এখন কথা এই যে—বৈদিক ইষ্ট হবেন মূল ইষ্ট, অথচ রঙ্গদেবতা পূজনের কালে 'মহাদেব' হবেন তাৎকালিক উপাস্য এরকম ব্যাপার আত্ম-প্রবঞ্চনা ত' বটেই, এমন কি পরপ্রবঞ্চনাও বটে। এই আত্ম-পর প্রবঞ্চনার সম্ভাবনার নিবারণ কল্পেই বলা হয়েছে—'নাট্যাচার্য দীক্ষিত হবেন' অর্থাৎ ইতিপূর্বে তিনি যদি শৈবোপাসনামূলক দীক্ষা না নিয়ে থাকেন, তাহলে—'নাট্যাচার্য' ইতি পদে অভিষিক্ত হওয়ার কালে এই দীক্ষা গ্রহণ করবেন। অতঃপর, বলা হয়েছে—

স্থানভ্রষ্টং তু যো দদ্যাদ্ বলিমুদ্বিগ্নমানসঃ।
মন্ত্রহীনো যথা হোতা প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ তু সঃ ॥১০৩॥

অর্থ। বিশেষ এই যে যদি পূজাকারী উদ্বিগ্নমনা হয়ে অস্থানে বলিদান করেন, তা হলে তিনি মন্ত্রবিস্মৃত হোমকারীর ন্যায় প্রায়শ্চিত্তী হবেন (প্রায়শ্চিত্ত করবেন)।

তাৎপর্য। বলি দিতে উদ্বিগ্ন মানস হওয়ার কারণ এই যে (১) পশুবধ করতে অনভ্যাস, (২) পশুবধে পাপবোধ, অথচ যজ্ঞার্থে বলি দিতেই হবে, ইতি মানসিক দ্বন্দ্ব। প্রসঙ্গত, রঙ্গ-দেবতাগণের প্রত্যেকের উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ বলি-দান বিহিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে—ভূতসঙ্ঘ, রাক্ষসগণ এবং সাগর-সরিত দেবতার উদ্দেশে মাংস ও মৎস্য বলি বিহিত।

স্থানভ্রষ্ট বলি অর্থে এক দেবতার বলি অন্যকে দান নয়। বধ্যপশুকে যথাস্থানে আঘাত করে, এক আঘাতেই কার্য নিষ্পাদনীয়।

এই কয়টি শ্লোকে সমস্ত কথাই বলা হয়ে গেল। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে যায়। বলির মাংস শেষে ভাগ হতে বাধ্য। নাট্যাচার্য, নৃপতি ও নর্ত্তকীরই ভাগ পাবেন, ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুণ্ডুগুলি কার ভাগে রাখা হবে, এই বিষয়ে একটিও শ্লোক পাওয়া গেল না।

৩য় অধ্যায়ে উল্লিখিত অর্চনীয় দেব-দেবতাগণের নাম যথা—মহাদেব (সর্বলোকেশ্বর, ভব) পদ্মযোনি (ব্রহ্মা), সুরগুরু (বৃহস্পতি) বিষ্ণু, ইন্দ্র, গুহ (কার্ত্তিকেয়) সরস্বতী, লক্ষ্মী সিদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, মতি, ইন্দু সূর্য মরুৎ (সপ্ত বায়ু) লোকপালবর্গ (ইন্দ্রাগ্নিযমাদি অষ্ট) অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মিত্র অগ্নি, সুরবৃন্দ, রুদ্রগণ, বর্ণ (বর্ণদেবতাগণ) কাল কলি' মৃত্যু নিয়তি

কালদণ্ড, বিষ্ণুপ্রহরণ, নাগরাজ (বাসুকী) খগেশ্বর (গরুড়) বজ্র, বিদ্যুত, সমুদ্র সকল, গন্ধর্বাপ্সরোগণ, মুনিগণ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ গুহ্যক মহোরগ সকল, অসুরবর্গ, নাট্য বিঘ্নকারী ব্যক্তিবর্গ (দৈত্য-দানব বিশেষ) দৈত্য-রাক্ষস সকল, নাট্যকুমারীগণ, মহাগ্রামনীবর্গ (গ্রামাধিপতি দেব-দেবতা) এবং রাজর্ষিবর্গ।

বীণাদি তত্তাবদ্ আতোদ্য সকল ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা পূজাই।

পূজনাদি কর্ম সংক্ষিপ্ত ও শোভন। বলিদান কর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ পশুবধ মৃগয়া ছাড়া কদাপি শোভন হ'তে পারে না। কিন্তু—পূজা-হোমাদি সাংস্কারিক ঘটার পট-ভূমিকায় ও সাংস্কারিক দৃষ্টিতে এ রকম ব্যাপারের অশোভনীয়তা উপলব্ধ ও হয় না।

যাই হ'ক—ছল-যুদ্ধ দ্বারা সংস্কার-কর্মের অবশেষকে লণ্ড-ভণ্ড করে দেওয়ার মধ্যে একটি তাৎপর্য আবিষ্কার করা যায়। মাত্র এইটুকু স্বীকার করে নিতে হবে যে-সমগ্র ব্যাপারটি নাট্যগোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

দেবতা পূজন কর্ম আদোপান্ত লোক-সংস্কার ও কিছু পূর্বাগত ঐতিহ্য সাপেক্ষ। লোকাচার নশ্বর। তবুও শ্রুতি থেকে যায়। শ্রুতি তিরোহিত হয়, স্মৃতি মাত্র থেকে যায়। লোক-চিত্ত অবিনাশী আধার রূপে বর্তমান থাকে। এই আধার কখনও শূন্য থাকে না।

সর্বলোক হৃদয়ের অবিনাশী উৎকৃষ্ট অবদান হল নাট্য ও গান্ধর্ব। যাবতীয় নশ্বরত্বের চিন্তা-বিমর্শের ঊর্ধ্বে উঠে নাট্য-গান্ধর্ব পরিকল্পনা, কর্ম ও উপভোগ। নশ্বর, জরং স্বভাব সংস্কার-জাল ছিন্ন ভিন্ন করে, নাট্য-গান্ধর্বের অভিনয়, অপূর্ব ইন্দ্রজালের অভিব্যক্তি। কোনও একটি লৌকিক কর্ম লোকহৃদয়ের সর্বাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে পারে না। সেই কারণেই মানুষ বুদ্ধি ও পরিকল্পনা শক্তি দ্বারা নাট্য ও গান্ধর্ব সৃষ্টি করেছিল। এর মূলে লোকহৃদয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষা না থাকলে নাট্য-গান্ধর্ব বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত ও অবিনশ্বর হতে পারত না।

লোকহৃদয়ের মধ্যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, কথা-কাহিনী-প্রিয়তা, ও ইন্দ্রজাল-প্রিয়তা স্বাভাবিক গুণ। এই তিনটি গুণে নাট্য কালজয়ী।

অধিকন্তু—লোক হৃদয়ে ভয়-সংস্কারও আছে। মৃত্যুভয়, দুঃখ ভয়, অঘটন-ভয় প্রভৃতি অভিজ্ঞতা সর্বহৃদয়বেদ্য।

নাট্য কর্ম ও নাট্য-প্রেক্ষণ ব্যাপারের বৈশিষ্ট এই যে ভয়জনক কর্ম ও ঘটনা শ্রব্য-দৃশ্য হ'লেও প্রেক্ষকের মনে সাংস্কারিক ভীতি-চাঞ্চল্য উদ্ভূত হয় না, মৃত্যু বিভীষিকা দর্শন হ'লে ও মৃত্যু-ভয় হয় না। এক কথায়, লৌকিক বা বাস্তব ভয় থেকে নির্মুক্ত মানসেই নাট্য ধর্মের অসাধারণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। উক্ত ছল-যুদ্ধ দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে অল্পক্ষণের জন্য নির্মুক্ত মানসাবস্থার আস্বাদ পাইয়ে দেওয়া হয়। রঙ্গদেবতা পূজন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রিক্ত হ'তে বাধ্য। কিন্তু ঐ ছল-যুদ্ধগুলি যেন প্লাবনের জলের মতো নালী-প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করে যথার্থ বিপ্লব ঘটিয়ে, শেষে যখন অন্তর্হিত হয়, তখন দর্শকদের চিত্ত-চাঞ্চল্য, পাপ-বোধ, অধর্মাচরণ জন্য অনুতাপ সমস্তই ধুয়ে যায়। সেই নির্মুক্ত অবসরের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা কঠিন। শিবপ্রেরিত রুদ্র-প্রমথগণ দক্ষ-যজ্ঞ বিনষ্ট করেছিল, ইতি ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এই ছল-যুদ্ধগুলি যেন সেই দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংসের স্মারক—অর্থাৎ—লোকাচার বিনষ্ট হ'লেও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সংস্কার-নির্মুক্ত শিব-বুদ্ধি সনাতন রূপে প্রবর্তিত থাকে। এই শিব-বুদ্ধিই সম্প্রতি নবীন নাট্যগৃহে অধিষ্ঠিত থাকুক, এবং—চিরতরে নাট্য-গান্ধর্ব কর্ম ও প্রেক্ষাকে সার্থক করুক, এই হ'ল তাৎপর্য।

রুডলফ্ রথ্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ইউরোপে বেদ চর্চার প্রধান ঋত্বিক্ রুডলফ্ রথ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ষ্টাট্‌গার্ট নগরীতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। টুবিংগেন (জার্মানী)হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল প্রটেষ্টান্ট ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি হেইনরেখ্ ওয়াল্ড নামক জনৈক সংস্কৃতবিদ্ অধ্যাপকের প্রেরণায় সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছুকাল পর যাজকের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন ও টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট্' (পি-এইচ্-ডি) লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভার্থে তিনি অতঃপর প্যারী নগরীতে চলিয়া আসেন। প্যারীতে আচার্য বুর্নুফের নিকট কিছুকাল সংস্কৃত শিক্ষা লাভান্তে রথ্ ইংল্যান্ড গমন করেন। এখানে ইণ্ডিইণ্ডিয়া হাউস ও বড্‌লিয়ন পাঠাগারে রক্ষিত বেদের পুঁথিগুলি তিনি পড়িবার সুযোগ পান। সমাজভাবে বেদচর্চার সুবিধার জন্য তিনি এইগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করিতে থাকেন। নিজের প্রয়োজনীয় তথাদি সংগ্রহের পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রথ টুবিংগেন প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘকাল বেদচর্চার ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি বৈদিক সাহিত্যও বেদের ঐতিহ্য বিষয়ে জার্মান ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন*। রথের এই পুস্তকখানিকে ইউরোপে বৈদিক আলোচনার প্রথম পুস্তক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই পুস্তকে উপস্থাপিত তথ্যাবলী রথ্ নানাস্থানে রক্ষিত বেদের পাণ্ডুলিপি গুলি হইতেই সংগ্রহ করেন -অন্যকোন পুস্তক অথবা অন্যকোন পন্ডিতের মতামত তিনি এই গ্রন্থে ব্যবহার করেন নাই। বেদ-সম্বন্ধে ইউরোপে এযাবৎ বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয় নাই। ইতিপূর্বে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রোজেন নামক জার্মান পন্ডিত কর্তৃক ঋগ্বেদের মাত্র ৮ম মন্ডল পর্যন্ত অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এই সামান্য অনুবাদাংশ ও কোলব্রুক কর্তৃক লিখিত বেদসম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ মাত্র বেদ সম্বন্ধে অনুরাগী সুধীজনের অধিগত ছিল। প্যারীতে আচার্য বুর্নুফের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ম্যাক্সমুলের ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেন। ম্যাক্সমুলেরের ঋগ্বেদের অনুবাদ (১ম খন্ড) রথের বেদসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশের প্রায় তিন বৎসর পর প্রকাশিত হয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রথ তাঁহার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, কয়েক বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট পুস্তকাগারের কর্তৃত্ব ও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। বেদসম্বন্ধীয় পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর বেদ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে রথের খ্যাতি সবিশেষ বৃদ্ধি পায়, ইহাদ্বারা টুবিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও প্রাচ্যবিদ্যার তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করে। বেদচর্চার পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রথ যাস্কের নিরুক্তের একটি সটিক সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। যাস্কের নিরুক্ত বেদের প্রাচীনতম টিকা বলিয়া পরিগণিত।

বেদসম্বন্ধীয় আলোচনা ব্যতীত রথের জীবনের এক বিরাট কীর্তি অপর এক জার্মানসুধী অধ্যাপক অটো ব্যোট্‌লিঙ্কের সহযোগিতায় একটি বিরাট অভিধান প্রণয়ন। এই বিরাট অভিধানটি সেন্ট পিটসবার্গের একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস য়্যান্ড আর্টস্ কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় উহা

সেণ্ট পিটসবার্গ অভিধান নামে বিখ্যাত। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানের শেষ সপ্তমখণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথমখণ্ডটি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শুধু এই অভিধানের বেদও বৈদিকযুগ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত শব্দাবলী সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা করেন। বৈদিকোত্তর 'ক্লাসিকাল' শব্দাবলী সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন রথের সহযোগী পণ্ডিত ব্যোট্‌লিঙ্ক। বৈদিক সাহিত্যে অগাধ পারদর্শিতার কারণে রথের এই অভিধান শুধু শব্দাবলীর তালিকায় পর্যবসিত হয় নাই। শব্দাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৈদিকযুগের ভাষা, সামাজিক পরিবেশ এবং বৈদিক আর্য জাতির অধ্যাত্মভাবনার উৎকৃতিসহ যথাযথ উপস্থাপন এই অভিধানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেদ বিষয়ে রথের গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায়, কল্পনা কুশলতাও নিষ্ঠার সমাবেশ বশতঃ এই অভিধানটি ভারতচর্চার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই অভিধানের অঙ্গ মহিমার একটি প্রামাণ এই যে পরবর্তী কালে সকল সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন কর্তৃগণ এই অভিধানটিকেই আদর্শ রূপে রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদচর্চায় এই অভিধানটি আজিও অপরিহার্য। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লেলিনগ্রাড পরিদর্শন করেন। এই সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 'একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস' এর পক্ষ হইতে তাঁহাকে এই বিশ্ববিশ্রুত অভিধানের একখণ্ড উপহার দেওয়া হয়। সেণ্ট পিটসবার্গের নাম বর্তমানে লেলিনগ্রাড। প্রবল প্রতাপান্বিত জার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত তদানীন্তন সেণ্ট পিটসবার্গ তত্রস্থ রাজকীয় একাডেমির কেন্দ্রস্থল ছিল। লাইপজিগ্ (বর্তমানে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিকের অন্তর্ভুক্ত) নিবাসী অধ্যাপক অটো ব্যোট্‌লিঙ্ক এই রাজকীয়একাডেমির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। পিটসবার্গ অভিধানটি স্বিতীয় জার আলেকজেণ্ডারের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন কার্যের অবসর কালে রথ তাঁহার বিশিষ্ট মার্কিন অন্তেবাসী অধ্যাপক হুইট্‌নির সহযোগিতায় অথর্ব বেদের একটি সংস্করণ সম্পাদন পূর্বক প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি শিষ্যবর্গের সহায়তায় আরও কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদন করেন। পুস্তক সম্পাদন ব্যতীত বিশ্বের বহু পত্র-পত্রিকায় রথ বহু নিবন্ধ প্রকাশ করেন। বৈদিক ধর্ম, পুরাণ ও বেদের ব্যাখ্যা এই সব প্রবন্ধের বিষয় ছিল। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রথের নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধ রাজি বিষয় গৌরব ও তথ্যপ্রাচুর্যের জন্য বিশ্বসমাজে সাতিশয় আদৃত ছিল।

বেদ ব্যতীত ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানেও রথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। পিটসবার্গ অভিধানের চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত শব্দাবলী রথের রচনা ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চরকের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে জার্মান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটির পত্রিকায় (২৬শ খণ্ড) রথের একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাগ্‌ভটের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধেও তিনি একটি তথ্যবহুল নিবন্ধ রচনা করেন। জরথুস্ত্র সম্প্রদায়ের (পার্শী) ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্তা' সম্বন্ধে রথ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই বিষয়েও তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

সমগ্র ইউরোপে বিশেষ ভাবে জার্মানীতে রথ বেদচর্চার প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত। ব্যক্তিগতজীবনে বেদচর্চা ব্যতীত টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী অধ্যাপনা কালে রথ বহু ছাত্রকে বেদ তথা ভারতচর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। রথের অধ্যাপনার এমনই আকর্ষণী শক্তিছিল যে তাঁহার প্রথম যৌবনের একটি ছাত্র ৪০ বৎসর বিরতির পর অন্যক্ষেত্রের কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট পুনরায় অধ্যয়ন করিতে আসে। বিদ্যার্থী ছাত্রটি এই সময় ষষ্ঠিতম বৎসর অতিক্রান্ত করিয়াছিলেন। কর্মজীবনান্তে ছাত্রজীবনের গুরুর নিকট অসমাপ্ত পাঠ পুনর্গ্রহণ করিতে আসা জগতের বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে একটি অসাধারণ ঘটনা। রথের

শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ভারত চর্চার ক্ষেত্রে হুইট্‌নি, গেল্ডনার, ম্যাকডোনেল, কায়েগী ও আর্ণল্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। রথের পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনার খ্যাতিবহু বিস্তৃত হওয়ায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে উচ্চতর বেতনে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইত। রথ এই প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তাঁহার জন্মভূমির বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় অতিবাহিত করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রথের ডিগ্রী প্রাপ্তির "জয়ন্তী" উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্মানার্থ একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪৪ জন মনীষীর রচনায় এই স্মারক গ্রন্থ সমৃদ্ধ হয়। বিশ্বের নানা বিশ্বব প্রতিষ্ঠান রথকে সম্মানিত সদস্য শ্রেণীভুক্ত করেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রথ অতিশয় বন্ধু বৎসল ও উদার হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। নির্জন নদীতীরে প্রাক্ষালতা বেষ্টিত তাঁহার কুটিরে বহু জ্ঞান ভিক্ষু পর্যটকের সমাবেশ দেখা যাইত। অতিথি বৎসল রথ শুধু তাঁহাদের শারীরিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, তাঁহার সযত্ন অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারা ও আগন্তুকদের সেবার উৎসর্গ করিতে কার্পণ্য করিতেন না।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন রথ তাঁহার কর্মক্ষেত্র টুবিঙ্গেন নগরীতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের রথকে কলিকাতাস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য শ্রেণী ভুক্ত করা হয়। রথের মৃত্যুর পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট সোসাইটির এক সভায় তাঁহার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সোসাইটির তদানীন্তন ভাষাতত্ব বিভাগীয় সম্পাদক "ভারত ভাষা বাচস্পতি" স্যার জন গ্রীয়ারসন্ এই শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

---

* Zur Litteratur und Geschichte des Weda—Rudolf Roth, 1846.
† Sanskrit Worterbuch—1852-1875.

জমিদার দ্বারকানাথ

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

দ্বারকানাথের পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই রাধানাথ জমিদারী দেখাশুনা করছিলেন। দ্বারকানাথের ১৮ বছর বয়স হলে এই পৈত্রিক জমিদারী রাধানাথ তাঁকে বুঝিয়ে দেন। সম্পত্তি বিরাট না হলেও নিতান্ত কমও ছিল না—আয় ছিল তখনকার কালে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা।

সম্পত্তির একটী অংশ ছিল কটকের কাছে পাণ্ডুয়া ও পহরাজপুরে। অন্য অংশটী কুষ্ঠিয়ার (কিশোরী মিত্রের মতে পাবনার) বিরহিমপুর পরগণায়। এই বিরহিমপুরের প্রজারা প্রথমে দ্বারকানাথকে ছেলেমানুষ ও নতুন ভেবে বেশ একটু বেগ দিতে চেষ্টা করেছিল। নায়েবের বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে, জমিদারের বিরুদ্ধে কালেক্টরের কাছে একটা না একটা গোলমাল লাগিয়ে জোট বেঁধে খাজনা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত।

একবার তারা সদরে জমিদারের কাছে খবর দিলে যে নায়েব বড় অত্যাচার করছে। অনুসন্ধানের জন্য দ্বারকানাথ সেই দিনই রওনা হয়ে, কুমারখালি পর্যন্ত পাল্কিতে গিয়ে তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কাছারীতে গিয়ে উপস্থিত। এত তাড়াতাড়ি জমিদার আসবেন এটা প্রজারা আশা করে নি, তাই খোঁজ খবরে প্রমাণ হয়ে গেল নালিশটা মিথ্যা।

এতে সুবিধা হয় না দেখে কিছুদিন বাদে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রজারা জানালো যে জোর করে খাজনা আদায় হচ্ছে। (নালিশটা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা এমন বোধহয় না। একটুও জোর না দেখিয়ে খাজনা আদায় বোধহয় জমিদারী প্রথার আদ্যোপান্ত খুঁজলেও পাওয়া যায় না। কিন্তু সে কথা যাক।) ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নায়েব গোমস্তার অত্যাচারের ফলাও কাহিনী শুনে প্রজাদের অভয় দিয়ে গ্রামে এসে তাঁবু ফেল্লেন সরেজমিনে তদন্ত করতে—কিন্তু তিনি জমিদারপক্ষের কারুর কোন আপত্তি কৈফিয়ৎ তলবও করলেন না। এই খবর পেয়ে দ্বারকানাথ আবার বিরহিমপুরে দৌড়ে এলেন। সন্ধেবেলা পৌঁছে সেই রাত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবুতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সাহেব আমলাদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করা বিষয়ে দ্বারকানাথকে এক লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিলেন। সাহেবের খবর ও তার উপর নির্ভর করে পৌঁছানো সিদ্ধান্তগুলো দ্বারকানাথ যখন দফাওয়ারী ভাবে ভুল প্রমাণ করলেন, তখন সাহেব খুব চটে গিয়ে বল্লেন যে ন্যায় হোক অন্যায় হোক সাহেবেরা যখন যা করেন তা কোনমতে ভুল হতে পারে না।

দ্বারকানাথ তখন জিগেস করলেন যে পুলিশের বড়সাহেবের কাছেও কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কথা বলতে প্রস্তুত?

সাহেব পালটা প্রশ্ন করলেন "তার মানে?"

দ্বারকানাথ তখন সাহেবের পূর্ব জীবনের ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তখনকার কালে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করবার মত কড়া তদারক বা শাস্তি পাইবার উপযুক্তভাবে নালিশ করবার লোকের একান্ত অভাব ছিল। তাই সরকারী সাহেব এমন খুব কমই ছিলেন যাঁদের নানাদোষ ও অপকীর্তি ছিল না। সরকারী সাহেবদের সংখ্যা ও কম ছিল, তাই দেশী লোকদের তাদের দোষগুণের খবর পাওয়ার অসুবিধা ছিল না। দ্বারকানাথ নিজের জমিদারী এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছুটা খবরাখবরও পেয়েছিলেন। কাজেই সাহেবের ভুল বা অপকীর্তিও বেশ কিছু জানা ছিল। ঐসব ব্যাপারের জন্য পুলিশ সাহেবের কাছে নালিশ

করবার ভয় দেখাতেই সাহেব নরম হলেন।

আরেকবার বিরহিমপুরে খাজনা আদায় করতে গিয়ে দ্বারকানাথের কর্মচারী ও প্রজাদের মধ্যে লাঠালাঠি হয়ে দুজন খুন হয়। দ্বারকানাথের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোয়। তিনি গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারকানাথের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি নির্দোষ তখন কি ভাবে মকদ্দমা চালালে তাঁর জয় হবে সে উপায় বাৎলে দেন এবং বিদ্রোহী প্রজাদমনেরও ব্যবস্থা করে দেন।

কিছুদিন পরে এই সাহেবই অসুখ করে কোলকাতায় আসেন—ছুটী নিয়ে বিলেত গিয়ে সুস্থ হবেন বলে। তিনি একজনের কাছে অনেকটাকা ধারতেন। সাহেব বিলেত চলে গেলে সে টাকা পাওয়ার আশা নেই বলে সেই মহাজন সাহেবের যাওয়া বন্ধ করবার চেষ্টা করতে থাকে। সাহেব মহাবিপদে পড়লেন। দ্বারকানাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "ঐ টাকাটা সংগ্রহ করে দিতে পারো?" দ্বারকানাথ তখনও এমন অবস্থাপন্ন হন নি যে ঐ টাকা নিজে তৎক্ষণাৎ দিতে পারেন, তবু কৃতজ্ঞ দ্বারকানাথ ঐ টাকা সংগ্রহের ভার নিলেন। রাজা সুখময়ের বংশধর রাজা শিবচন্দ্র রায় তাঁর পিতৃবন্ধু, তিনি তাঁর কাছে গিয়ে এ ব্যাপার বলেন। শিবচন্দ্র মহাশয় লোক ছিলেন। বন্ধু পুত্রের উপকারের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ দ্বারকানাথের হাতে দেন। এর পর চিরদিন শিবচন্দ্র বা তাঁর পুত্রদের বৈষয়িক ব্যবস্থায় যে কোন সাহায্য দরকার হয়েছে দ্বারকানাথ তা অম্লানবদনে, অকাতরে করেছেন। * (১) ঐ টাকা দিয়ে মহাজনের দেনা মিটিয়ে দ্বারকানাথ যখন সাহেবকে গিয়ে বল্লেন যে বিলাত যাবার আর কোন বাধা নেই, তখন সাহেব কেঁদে ফেল্লেন। তারপর উঠে গিয়ে একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে গেলেন। দ্বারকানাথ বাধা দিয়ে বল্লেন যে-তার কোন দরকার নাই।" "আপনি যদি জীবিত না থাকেন ত ওর কোন মূল্যই থাকবে না; আর যদি জীবিতাবস্থায় এদেশে ফিরে আসেন ত' ঐ টাকা ইচ্ছামত ফিরৎ দিবার কোন অসুবিধাই নাই।"

জমিদার চোখ বুজে থাকলেও জমিদারী একালে যদি বা কোন রকমে চলিত, সে যুগে কোনমতেই চলিত না। তখন কোম্পানীর নতুন যুগ, চারিদিকে ভাঙ্গাগড়া নতুন নতুন আইন, কড়া শাসনের অভাব। জমির এলাকা নিয়ে বিবাদ লেগেই থাকত। তা ছাড়া দুর্বৃত্ত প্রজা, পার্শ্ববর্তী নীলকর সাহেব বা দেশী বড় কোন জমিদার থাকলে সর্বদাই অশান্তির আশঙ্কা ছিল। এর প্রতিকার হিসাবে দ্বারকানাথ অনেক জায়গাতেই সাহেব ম্যানেজার রেখেছিলেন। তারা ইংরাজী ভালো বোঝার দরুণ সরকারী কাজে সুবিধা হত। জমিদারী সেরেস্তার ঢিলাঢালা বিশৃঙ্খলতার মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা আসিত। সর্বোপরি তখনকার কালে সাদা চামড়ার ভয় ও প্রতিপত্তি একালের চেয়ে প্রবল ছিল বলে কাজ চালানো সুবিধা হইত। কিন্তু সাহেবদের উপরেও দ্বারকানাথ নিজে সর্বদা কড়া নজর রাখতেন। ১৮৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে জে, সি, মিলারকে সাজাদপুরে দেড়শ' টাকা বেতন ও শতকরা দশ টাকা কমিশনে বহাল করবার সময় তার নিয়োগপত্রে, কি কি কাজ করতে হবে তার বড় ফিরিস্তি আছে। * (২) সমস্ত জমিদারী ও ব্যবসায়ের হিসাব ম্যানেজাররা তাঁর কাছে আমলা—সরকার মারফৎ পাঠাতেন। দ্বারকানাথ নিজে সব হিসাব পরীক্ষা

* (১) "এই গল্পটী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট শুনা যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথের মহত্ত্বে এতটা মুগ্ধ ছিলেন যে জীবনচরিত লিখবেন বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর' মতিলাল শীল ও কৃষ্ণবরণ পাণ্ডির জীবনচরিত লিখিবেন।"

করে ব্যয় কমনো বা আয় বাড়ানো সম্বন্ধে মন্তব্য ম্যানেজারদের লিখে জানাতেন। *(৩) নিজের জমিদারীর তিনি কতটা উন্নতি করেছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ দেখি প্রথমবার বিলাত যাবার সময় দ্বারকানাথ যখন সম্পত্তি ট্রাষ্টভুক্ত করেন তখন বিরাহিমপুর ও কটকের আয় ত্রিশ হাজার থেকে সত্তরহাজার টাকায় পৌঁছেছে।

জমিদারী চালাতে হলে আইনকানুন জানা সবসময়েই দরকার। বিশেষ সে সময়ে লর্ড কর্নওয়ালিস সবে মাত্র নতুন আইন ও রেগুলেশন করেছেন। দ্বারকানাথ আইন শেখবার জন্য কাটলার ফার্গুসন নামে এক ঝানু ব্যারিষ্টারের কাছে শিক্ষানবিশী করেন। জেলা কোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত যে সব আইন চালু ছিল এবং বিচারপদ্ধতি সব তিনি খুঁটিয়ে শেখেন। তখনকার কালে যে দুচারজন সাহেব ব্যারিষ্টার ছিলেন বাঙ্গালীরা তাঁদের কাছে ঘেঁসতে সহজে সাহস করতেন না। তাই অনেক বড় বড় জমিদাররাও দ্বারকানাথকে জমিদারী মকদ্দমাসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা প্রতিনিধি (ল এজেন্ট) করে দিয়েছিলেন। একাধারে ইংরাজী, আইন ও জমিদারীকাজ জানার দরুণ তাঁর নিজের জমিদারীর তদারকেরও যেমন সুব্যবস্থা হয়েছিল, তেমনি

---

*(২) It will be desirable to ascertain the former actual jammas of the different Torofs, mouzas, kishmut and jote etc., composing the estate and gradually adjust these with more regard to equity and justice than has been hitherto the case, and in a manner that my interest may not be overlooked, bearing at the same time in mind that the ryots be not oppressed. To accomplish this, all villages must be measured and a reasonable *nirick* fixed varying according to the quality of land and other local circumstances by which they may be affected.

It will of course be very desirable that as many *Potit* or waste lands be brought under cultivation as possible, and that you endeavour to settle ryots on them, to affect which some sacrifice as to rate of rent will probably have to be made in the first instance to induce settlements of ryots taking place. The *nirick* might afterwards be raised as circumstances would admit of. Whenever possible waste lands, as well as indeed, lands already under cultivation should be parcelled out to ryots residing on the Estate in preference to ryots who are not, commonly called Pyecosta ryots.

Enquiry should be instituted as to the boundary lines of the different mouzahs and kishmats where they border on other zamindar's estates so that encroachment may be prevented, and that where such have already taken place, restitution may be sought to be obtained.

With a view to adopt ulterior measures for repossession of lands now illegally held possession of by parties, you must endeavour to collect information as to the nature of the tenures they hold these lands by and of all circumstances bearing on the cases which might in any way prove useful to establish my right to repossession. This applies to all descriptions of lands including Brahmottar, Devottar, Lakheraj and purpable etc.

Before instituting law-suits likely to incur considerable expense I shall expect to be consulted on the affair.

*(৩) যশোরে ম্যানেজার টি রাইস সাহেবকে ১৮৬৫ সালের ২২ ডিসেম্বর লিখেছেন—
your sircars have been ordered back to your station, the accounts which detained

অন্যদেরও তিনি সাহায্য পরামর্শ দিতে পারতেন। তাঁর পরামর্শে বা চেষ্টায় অনেক জমিদার ক্ষতিগ্রস্ত বা সর্বস্বান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। তার মধ্যে বগুড়ী পরগণার জমিদার বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, যশোরের রাজা বরদাকান্ত রায়, কাশিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায় প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যায়।

পরে যখন দ্বারকানাথ সরকারী চাকুরী নিলেন, তখনও অনেকে তাঁর হাতে নিজেদের জমিদারী চালাবার ভার সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন বা তাঁকে অনেকদিন পর্য্যন্ত বৈষয়িক ব্যাপারে সর্বোচ্চ উপদেষ্টা করে রেখেছিলেন।

যে কোন সময়ে এই ধরণের কাজে সফলতা লাভ করতে হলে ক্ষুরধার বুদ্ধি, সত্যাশ্রয়ী অথচ অমায়িক এবং লোকজনকে মুগ্ধ করবার মত ক্ষমতার দরকার হয়। বিশেষতঃ তখনকার কালে—যখন আদালতে ন্যায় বিচার পাওয়া নির্ভর করত ভাগ্যের উপর, আর বড়লোকদের মধ্যে সময় কাটতো দলাদলিতে। সেই সময় রাজা বরদাকান্ত, রাণী কাত্যায়নী প্রমুখ বড় বড় জমিদারদের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও ব্যবস্থাকর্ত্তা হওয়ার জন্য দূরদর্শিতা ছাড়াও বহু গুণের প্রয়োজন ছিল।

সব সময়ে তাঁর পরামর্শমত চলতেন এরকম "বাঁধা ঘর" ছাড়াও বহু জমিদার কোন বিশেষ বিপদে পড়লে তাঁর কাছে ছুটে আসতেন। সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ বসু তাঁ বড়ছেলে মহেন্দ্রনাথকে একবার ত্যাজ্যপুত্র করেন। মহেন্দ্রনাথ তখন দ্বারকানাথকে ধরায় তিনি পাথুরিয়াঘাটার বৈষ্ণবচরণ মল্লিকের সালিসীর দ্বারা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে দেন।

আরেকজন ত্যাজ্যপুত্রের কথা ওঠে গরাণহাটার জয়চাঁদ মিত্র সম্বন্ধে। তাঁর পিতা শেখর মিত্র জয়চাঁদকে বাদ দিয়া দ্বিতীয় স্ত্রীও মেয়ের নামে উইল করেন। জয়চাঁদ দ্বারকানাথকে বলতে দ্বারকানাথ একমাত্র ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করা যায় না এই নজিরে সম্পত্তি ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা করে দেন।

মফঃসলের কোন এক জমিদারের অসাবধানতায় তাঁর একটি বড় জমিদারী নিলামে ওঠবার উপক্রম হয়। স্থানীয় কলেক্টর সাহেব উপযুক্ত ক্রেতা সংগ্রহের জন্য কলিকাতার শেরিফকে অনুরোধ করেন যে কলিকাতায় ঐ নীলামটী করা হউক। যাঁর জমিদারী তিনি দেখলেন যে, যে জেলার জমিদারী সেই জেলায় নিলাম হলে তিনি সেটা কিনে নিতে পারেন কিন্তু কলিকাতায় নিলাম হলে বহু ক্রেতার মধ্যে ঐ জমিদারী আবার কিনে নেওয়া শক্ত—প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কিন্তু ওরকম ব্যবস্থা করানো সহজ নয়। যিনি শেরিফ তিনি 'না' না বললে কলিকাতাতেই নিলাম হবে—রদ করবার উপায় নাই। জমিদারী কলিকাতায় এসে দ্বারকানাথের শরণ নিলেন।

---

them, having been gone through by me. From these I find that the establishment and other contingent expenses have been received from the Sugar Factory. This heavy outlay can, it strikes me, be obviated by your entertaining a permanent establishment and taking care that whenever you send us a commission for articles, you include in it all the items you require; so that the boats conveying them will not only have a full freight and thereby prevent the expense of hiring so many boats from time to time, but that the immense charge now incurred on account of toll at Tolly's Nullah of which there was no less than 'sa Rs. in the last year by so many boats going to and fro may be easily saved. If economy be observed in every department of the Sugar Factory. I am still of opinion that it will be a success".

দ্বারকানাথ বল্লেন, "ঐটা বিশেষ লাভজনক সম্পত্তি বলে আমি নিজেই কেনার মনস্থ করেছি।"

জমিদারের তখন মহামুস্কিল হল। যাঁর আশ্রয় চাইলেন, দেখা গেল তিনিই প্রতিপক্ষ। জমিদারটি কাতর হয়ে কেঁদে ফেল্লেন। দ্বারকানাথ কারো চোখের জল সইতে পারতেন না, কাজেই বললেন—"বেশ আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু বর্তমান শেরিফের সঙ্গে কোন কারণে আমার বিবাদ আছে। ফল কতদূর হইবে জানি না। আমি অনুরোধ করিলে কখনই সে রাখিবে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি, যতটা পারি আপনার সাহায্যের চেষ্টা করিব।"

তারপর দ্বারকানাথ শেরিফকে গিয়া জানালেন যে যদি অমুক জমিদারী নিলামের ব্যবস্থা কলিকাতায় হয় ত বড় ভাল হয়, কারণ দ্বারকানাথ বেশী দাম দিয়েও তা কিনতে তৈরী আছেন। শেরিফ দ্বারকানাথের প্রতি বিদ্বেষী, দ্বারকানাথের সুবিধা হবে জেনে একেবারে বেঁকে বসলেন, বল্লেন, "তাও কি সম্ভব দ্বারকানাথ! ওটা অমুক জেলার জমিদারী, সেই জেলাতেই নিলাম হবে।"

দ্বারকানাথ আগ্রহ জানিয়ে বল্লেন, "আপনি আমার বন্ধু। আপনি যদি এই সামান্য উপকারটুকু না করেন ত' আমি অন্য কার কাছে সাহায্য চাইব বলুন?"

শেরিফ বল্লেন, "সে কি হয়? আমি তা পারি না। জেলার কলেক্টর অবশ্য এখানে নিলামের জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু আমি এখনই তা সম্ভব নয় তা জানিয়ে দিচ্ছি।"

দ্বারকানাথ বল্লেন, "কালেক্টর যদি ব্যবস্থাই করে থাকেন তবে আপনি কেবল দয়া করে সেটা বদল করিবেন না। এতে আমার উপকার হয়। এত সহজ উপায়ে একটি বন্ধুর উপকার করতে আপনার আপত্তি থাকতেই পারে না।"

শেরিফ বল্লেন, "আমায় মাপ কর দ্বারকানাথ, এ সম্ভব নয়। তুমি বসিয়া দেখ আমি তোমার সামনেই কলিকাতায় নিলাম না হইবার হুকুমনামা লিখিয়া দিতেছি।" এই বলে শেরিফ তখনই পত্র লিখিলেন। লেখা শেষ হলে দ্বারকানাথ হেসে বল্লেন, এখন আশা করি আমার প্রিয় বন্ধু শেরিফের রহস্য এইখানেই শেষ হবে। ঐ চিঠি এই টেবিলেই থাকিবে, পাঠানো আর হইবে না।"

শেরিফ বলিলেন, "না দ্বারকানাথ তুমি ভুল করছ। এ বিষয়টা এতই জরুরী যে এই দেখ এখনই এ পত্র রওনা করে দিতেছি।" এই বলে সাহেব চাপরাশীকে ডেকে চিঠিটা পাঠাবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীর হাতে দিতে বল্লেন।

দ্বারকানাথ দেখলেন, তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। নিলামের স্থান কলিকাতা থেকে পরিবর্ত্তনের হুকুমনামা পাঠানো হ'ল। তখন সাহেবকে অনুরোধরক্ষায় নিতান্ত অপারগ বুঝে যেন কাতর এমনি ভাবে বিদায় নিলেন।

শোনা যায়, জমিদারটি সমস্ত জেনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দ্বারকানাথকে লক্ষ টাকা প্রণামী দিতে চেয়েছিলেন।

কেরীসাহেব ও বহুভাষা-কোষ

অজিত দাস

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কাশিমবাজার কুঠির কুঠিয়াল জে. মার্শাল, সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহলী হন এবং সে সম্বন্ধে চর্চা করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ইংরাজী অনুবাদ ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন এবং সেই পান্ডুলিপিটি ইংলন্ডে প্রেরণ করেন, সেটী পরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হয়।

তারপর পলাশীর যুদ্ধে, হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাঙলাদেশে ইংরাজ রাজত্বের গোড়াপত্তন হল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চব্বিশ পরগণার জমিদারী লাভ করে বটে, কিন্তু সমগ্র বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে আরও কয়েক বৎসর পরে। রাজত্ব লাভ করলেও মহামান্য কোম্পানীর কর্মচারীগণ প্রায় একশত বৎসর এদেশীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ কৌতূহল কেন প্রকাশ করেন নি সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। হয়ত বিজয়গর্বী ইংরাজ বিজিত কালা আদমীদের বিষয়ে কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করা অহেতুক বলে মনে করতেন।

রাজ্যশাসন ব্যাপারে, ভাষাগত অসুবিধা অহরহ অনুভব করতে হত কোম্পানীর কর্মচারীদের। দেশীয় দোভাষীদের সাহায্যে হয়ত ব্যবসাবাণিজ্য চালান যায়, কিন্তু রাজ্যশাসন ও বিচার বিভাগ চালনা করা কি উপায়ে হত তা বোধগম্য নয়। ওই সব দোভাষী এবং মুনশীরা পারসী ও বাঙলা ভাষার সমন্বয়ে এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করে কোম্পানীর কর্মচারীদের বিষয়-বস্তু বুঝিয়ে দিতেন এবং কর্মচারীরা সেই ভাষার উপর নির্ভর করে রাজ্যশাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, তারজন্য প্রায় সময়েই প্রচুর বিভ্রাট উপস্থিত হত তারও নজীর আছে। এমনকি ওই ভাষার অপার মহিমায়, অনেক সময় নির্দোষী ব্যক্তিও অহেতুক সাজা পেত। সেই অপরূপ ভাষার কিছু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করছি— **"সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মোকাম আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকরর হইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সরঈ সাহেব জিলাদিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেওয়া সহর কলিকাতা জেবড় আদালতে তাবে আছে জারি থাকিবেক. .** " ইত্যাদি (এন. বি. এডমণ্ড ষ্টোনের লেখা একটী আইন পুস্তকের কিয়দংশ) এইরূপ পারসী শব্দ-বহুল বাঙ্গলা ভাষার দ্বারা রাজ্যশাসন ও বিচারকার্য্য চালালে অঘটন ও বিচার-প্রহসন যে ঘটবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে। এইরূপ এক বিচার বিভ্রাটের ফলস্বরূপ—"১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে দেশীয় ভাষা না জানার দরুণ কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে অপসারিত করা হইয়াছিল" (বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ—সজনীকান্ত দাস। পৃঃ ২৩)

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর অপরার্ধেও ইংরাজ শাসকবর্গ ও কর্মচারীরা এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রতি কৌতূহল ও উৎসাহবোধ ব্যাপকভাবে প্রথম দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, একজন ইংরাজ কর্মচারী, ভারতীয় ভাষা এবং বাঙলাভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উৎসাহী হন ও চর্চা করেন। ইনি এ কম্পেনডিয়াস্ ভোকাবোলারী, ইংলিশ এ্যাণ্ড পার্শিয়ান, কম্পাইল্ড ফর দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী নামে একটি শব্দকোষ সম্পাদন করেন। পুস্তকটি মাল-

দহ থেকে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

যদিও প্ল্যাডউইন সাহেব তাঁর 'এ কম্‌পেনডিয়াস্‌ ভোকাবোলারী' নামক পুস্তকে বাঙলা ভাষা বিষয়ে ইঙ্গিত ও আলোচনা করেছিলেন কিন্তু সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষা ব্যবহার করেন নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড তাঁর 'এ কোড্‌ অব্‌ জেন্টুলস্‌' নামক হিন্দু আইনের বহুখ্যাত ইংরাজী অনুবাদ পুস্তকে, অবশ্য, মুদ্রিতমেয় কয়েকটী শব্দ মাত্র ওই পুস্তকে ব্যবহার করেছিলেন। পুস্তকটী লন্ডন থেকে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে অমালে পুস্তকটীকে অতি প্রয়োজনীয় আইন-পুস্তক হিসাবে গণ্য করা হত।

পরবর্তী ইতিহাস বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজনা, যা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড সাহেব 'এ গ্রামার অব্‌ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' পুস্তকটী সম্পূর্ণ করে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস মহাশয়ের হস্তে প্রদান করেন ও তাঁকে ওই পুস্তকটী মুদ্রণের ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বাধা উপস্থিত হল বাঙলা হরফের অভাবে, তখনও বাঙলা হরফের জন্মলাভ হয়নি। হেষ্টিংস, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাইব্রেরীয়ান চার্লস উইলকিন্সের স্মরণাপন্ন হলেন। বাঙলা দেশে তিনিই একমাত্র উৎসাহী লোক যিনি প্রথম বাঙলা হরফের সাট (ফাউন্ট) তৈরী করবার চেষ্টা করেছিলেন। হেষ্টিংসের অনুরোধে উইলকিন্স, হুগলীর পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাঙলা হরফ তৈরী করেন ও মিঃ এণ্ড্রুস নামে হুগলীর জনৈক ছাপাখানার মালিকের সাহায্যে হালহেড সাহেব বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম পুস্তক মুদ্রিত করে এক অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করেন। ব্যাকরণটী কোম্পানীর কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার্থে মুদ্রিত করা হয়েছিল এবং বাঙলা ভাষার নমুনা স্বরূপ বিদ্যাসুন্দর, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

বাঙলা ভাষা ও মুদ্রণ-কার্য্যের গোড়াপত্তনীতে যে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ আজীবন সাধনা করেছেন, তাঁরা হলেন ফ্রান্সিস প্ল্যাডউইন, নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, জোনাথান ডানকান, এন, বি, এডমণ্ডস্টোন, হেনরী পিটস্‌ ফরস্টার, এ আপজন এবং জন মিলার। এঁদের কার্য্যকাল ১৭৭৮ থেকে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই অবধি বাঙলা ভাষার; পূর্ব-ইতিহাসের; একটি সংক্ষিপ্ত রূপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কারণ তারপরের কথা সবটুকুই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অপূর্ব্ব সাহিত্য কীর্ত্তির ইতিহাস এবং এই উজ্জ্বল অধ্যায়ের পরমপুরুষ হলেন উইলিয়ম কেরী ডি. ডি. যাঁর সহৃদয় ও সুযোগ্য পরিচালনায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠনের পথে অগ্রসর হয়।

শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করবার পূর্ব্বে শ্রীরামপুর সহরের অবস্থা তখন কেমন ছিল তার বিবরণ পেশকরার আবশ্যকতা অনুভব করছি। শ্রীরামপুর সহরের পত্তনের ইতিহাস যা পাওয়া সম্ভব হয়েছে তা হল এই—'শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের রাজার অধীন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ডেনিস বণিক বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে ৬০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া এইস্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার পূর্ব্বে, দক্ষিণ, ও পশ্চিমদিকের অনেকস্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।" ১

বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে শ্রীরামপুর তখন কলকাতার প্রতিদ্বন্দ্বী, ইউরোপের সর্বজাতির বাণিজ্য-জাহাজ সহরের পাশে গঙ্গার বুকে ভাসত আর গঙ্গার ঘাটে কিস্ত, ভাউলে, বজরা প্রভৃতি কতরকমের বিরাট নৌকা যে বাণিজ্যের পসার নিয়ে

১। "ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেরী"—রেঃ অমৃতলাল সরকার। পৃঃ ৩৯

বাধা থাকত তার ইয়ত্তা ছিল না।

শ্রীরামপুরের যখন এমত অবস্থা, তখন কলকাতা থেকে উইলিয়ম ওয়ার্ড, গ্রাণ্ট, ব্রান্সডন, মার্শম্যান, ফাউন্টেন প্রমুখ কয়েকজন মিশনারী এখানে উপস্থিত হন। কলকাতায় এঁরা মিশন স্থাপন করবার অনুমতি পাননি, কারণ, দূরদর্শিতপরায়ণ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিরোধীতা। কোম্পানীর কর্ম্মকর্তাদের যুক্তি ছিল, মিশনারীদের পরধর্ম্ম আক্রমণ করে বক্তৃতা দেওয়া, যার ফলে কোম্পানীর রাজত্ব বিপন্ন হতে পারে। শ্রীরামপুরে উপস্থিত হয়ে এঁরা, কি করা কর্ত্তব্য ঠিক করতে না পেরে মালদহের খিদিরপুর গ্রামে কেরীসাহেবের স্মরণাপন্ন হন। কেরীসাহেব তখন বহুজায়গা ঘুরে অনেক কষ্ট পেয়ে, খিদিরপুরের একটি ছোট কুঠির মালিক হয়ে সবেমাত্র স্থিতি লাভ করেছেন। ওয়ার্ড ও ফাউন্টেন মিশন স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বহুকষ্টে কেরীসাহেবকে রাজী করিয়ে ১৭৯৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরের পথে যাত্রা করলেন, সঙ্গে রইল তাঁর পরিবারবর্গ। খিদিরপুর গ্রাম থেকে শ্রীরামপুরে পৌঁছুতে প্রায় ১৭ দিন সময় লেগেছিল। ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে যাত্রা প্রায় শেষ হয়, এই দিনটি শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস বলে পরিগণিত। শ্রীরামপুরে পৌঁছে, কেরীসাহেব তাঁর এক বন্ধুকে সহরটীর সম্বন্ধে লিখলেন—"নগরটী বহুভাষাবাদী লোকে জনাকীর্ণ—ডেনিস, জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, পর্ত্তুগীজ, আর্ম্মেনিয়ান, গ্রীক, শিখ হিন্দু, মুসলমান!...." (ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেরী—রেঃ অমৃতলাল সরকার, পৃ. ৪২)। শ্রীরামপুর সম্বন্ধে আরও চমকপ্রদ বর্ণনা ওয়ার্ড ও মার্শম্যানের জার্ণালে ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে, সেগুলি মূল্যবান।

কেরীসাহেব প্রথমে ডেনমার্কের রাজপ্রতিনিধি কর্ণেল বী মহাশয়ের কাছে মিশন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কথাবর্ত্তা বললেন, কর্ণেল বী সানন্দে কেরীসাহেবের প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং মিশন স্থাপনের জন্য অনুমতি দিলেন। এতদিন মিশনারীগণ "মায়ার্স ট্যাভর্ণ" নামে একটি ডেনিস, সরাইখানায় বসবাস করছিলেন, কিন্তু কেরীসাহেব এই ব্যবস্থা বাতিল করে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করলেন। বাড়ীটিতে বসবাস করা ছাড়া আর কিছুই করবার উপায় ছিল না, জায়গার অভাব, কিন্তু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে কেরীসাহেবের মনে শান্তি ছিল না। একটি বড় বাড়ী কিভাবে অধিকার করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীরামপুরে একটী বড় বাড়ীর ভাড়া তখন প্রায় মাসিক ১২০৲ টাকার মত অর্থাৎ ১৪৪০৲ টাকা বৎসরে বাড়ীভাড়া বাবদ খরচ, যাহা বহন করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই কারণ যে সাহায্য ইংলণ্ড থেকে মিঃ ফুলার [১] মিশনের সম্বাৎসরিক ব্যয় স্বরূপ পাঠতেন তা অতি অল্প, অতএব বড় বাড়ীর অধিকার মিশনারীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু কেরীসাহেব সহজে হার মানবার পাত্র ছিলেন না, আর্থিক দুঃরবস্থা সত্ত্বেও তিনি একটি দুঃসাহসিক কাজ করলেন, গঙ্গার ধারে প্রচুর জমি সমেত একটি বড় বাড়ী ক্রয় করলেন, সর্বসাকুল্যে দাম স্থির হল ৬০০০৲ টাকা এবং এই ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে তাঁর কাছে তখন অর্দ্ধেক টাকাও নেই। অন্যান্য মিশনারীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যাপটিষ্ট মিশনের নামে বাড়ীটা ক্রয় করা হল এবং উপস্থিত মিশনারীগণ ট্রাষ্টি নিযুক্ত হলেন।

মিশনের নূতন বাড়ীটিতে প্রচুর জায়গা ছিলই উপরন্তু একটি বড় হলঘরও ছিল। হলঘরটি উপাসনার জন্য নির্বাচিত করা হল। আশেপাশে পতিত জমিতে কেরীসাহেব বাগান করলেন, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ এবং পৃথিবীর নানাদিক থেকে প্রচুর মূল্যবান বৃক্ষলতা

১। মিঃ এ্যাণ্ড্রু ফুলার, ব্যাপটিষ্ট মিশনের সম্পাদক ছিলেন।

আনয়ন করে সেখানে রোপণ করলেন। কালক্রমে সেই বাগান এক বিরাট বোটানিকাল গার্ডেনে পরিণত হয়, এক কোম্পানীর বাগান ব্যতীত অত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতা তখন আর কোথাও ছিল না। বৃক্ষলতাদি সম্বন্ধে কেরীসাহেবের এই অনুসন্ধিৎসা বহু বৎসর পরে এক বৃহৎ পুস্তক সম্পাদনে প্রভূত সাহায্য করে।

মিশনারীদের বাসস্থান উপাসনা গৃহ, মিশনের কার্য্যালয় ইত্যাদির সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে মিশন প্রেস স্থাপনের উদ্যোগ সুরু হল। উপাসনা গৃহের পার্শ্ববর্তী অপর একটি বাড়ীতে মিশনপ্রেস স্থাপিত হ'ল, বাড়ীটির চৌহদ্দি কতকটা এই রকম ছিল—লম্বায় ১৭০ ফিট ও প্রস্থে ৪৫ ফিট। উত্তরপ্রান্তের প্রবেশদ্বারে দুইটি বড় ঘরে 'কাউন্টিং হাউস' বা দপ্তর-খানা, এখানে যাবতীয় দলিল পত্রাদি ও মূল্যবান কাগজপত্র রাখা হত। দক্ষিণপ্রান্তের কতকগুলি ঘরে মুদ্রণের জন্য কাগজ এবং মধ্যবর্ত্তী ঘরগুলিতে টাইপ ও টাইপকেস সাজিয়ে রাখা হত। অপর পার্শ্বে আর একটি প্রশস্ত ঘরে, কুঠিয়াল জর্জ উডনির অনুমোদান ৪৬ পাউণ্ড মূল্যের কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছিল। মিশনপ্রেসের ভবিষ্যৎ প্রধান মুদ্রাকর উইলিয়ম ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, ফাউনটেন, ও কেরীসাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স এবং অন্যান্য মিশনারীগণ প্রভূত প্রযত্নে ও পরিশ্রমে মিশনপ্রেসকে কার্য্যক্ষম করে তুললেন কয়েক দিনের ব্যবধানে। এর পরে ওয়ার্ড নিজস্ব প্ল্যান অনুযায়ী দেশী কাগজ প্রস্তুত করবার যন্ত্র স্থাপন করলেন মিশন প্রেসের পার্শ্ববর্তী একটি গোল দেওয়াল ঘেরা জায়গায়। শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুত করবার যন্ত্র প্রথম স্থাপন করেন উইলিয়ম ওয়ার্ড। কলকাতা থেকে বাঙলা, ইংরাজী এবং অন্যান্য ভাষার হরফ মিশন প্রেসের জন্য ক্রয় করা হ'ল, কারণ বিখ্যাত হরফ নির্ম্মাতা পঞ্চানন কর্ম্মকার তখনও কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে এসে উপস্থিত হতে পারেন নি।

ধীরে ধীরে মিশন প্রেসে মুদ্রণের কাজ সুরু হল, কেরীসাহেবের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। ওয়ার্ড নিজ হাতেহরফ সাজিয়ে নিউ টেস্টামেণ্টের ম্যাথু-সমাচার পরিচ্ছদের প্রথম পৃষ্ঠা মুদ্রণ করবার জন্য সচেষ্ট হলেন, ইতিমধ্যে পঞ্চানন কর্ম্মকার শ্রীরামপুরে যোগদান করায় ওয়ার্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কারণ কলকাতা থেকে আনা বাঙলা হরফগুলি তাঁর মনোমত হয়নি, পঞ্চাননের প্রস্তুত হরফগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অবশেষে ওয়ার্ড সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বাইবেলের অংশবিশেষ "মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত" ১ পুস্তকের প্রথম শীট বাঙলায় মুদ্রণের সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

১৮০০ সালের ১৮ই মার্চ্চ কেরীসাহেব প্রথম সীটখানি মুদ্রণের জন্য প্রেসের হাতলে যখন চাপ দিলেন তখন মিশনারী ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে আনন্দের বান ডেকে গেল।

ইতিমধ্যে বাঙলা গদ্যসাহিত্যের জনক, শ্রীরামরাম বসু মিশন প্রেসে যোগদান করে সাহিত্যকর্ম্মে লিপ্ত হয়েছেন, খৃষ্টধর্ম্মের মহিমা প্রচারের জন্য লিখিত কয়েকটী কবিতা পুস্তক মুদ্রিত হয়ে গেছে এবং তিনি তাঁর যুগান্তকারী ঐতিহাসিক গদ্য পুস্তক "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" রচনায় ব্যস্ত।

মিশন প্রেসে কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হলেও আর্থিক অবস্থার উন্নতি কিছুমাত্র হয়নি। সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থের অনটন দূর হচ্ছেনা দেখে কেরীসাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কারণ যে বিশাল কর্য্যক্রম তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছেন তা বাস্তবে পরিণত করতে গেলে

১। এই পুস্তকটীর একটীমাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজের বোর্ডরুমে রক্ষিত আছে। পুস্তকটীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫ (ডিমাই আটপেজী)।

প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। মিশনারীবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি, কলকাতার সংবাদপত্রে মিশন প্রেস সম্বন্ধে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন আর্থিক সাহায্যের আশায়। আবেদনে সাড়া পাওয়া গেল বটে কিন্তু অন্যদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসার লক্ষণ দেখা গেল, কারণ লর্ড মর্ণিংটন বা মার্কুইস অব ওয়েলেসলী তখন গভর্ণর জেনারেল তিনি মিশনের আবেদন পাঠ করে চিন্তিত হলেন। তাঁর উদ্বেগের প্রধান কারণ, মিশন প্রেসের মুদ্রাযন্ত্রটী। তিনি চিন্তা করলেন, এই রকম একটী প্রেস রাজধানীর অতি নিকটে অথচ অন্য রাজশক্তির আশ্রয়ে থাকে তবে সমূহ বিপদ। রাজ্যশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কখনও কিছু অঘটন ঘটে তাহলে কলকাতা থেকে বিতাড়িত মিশনারীগণ বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে প্রেসের সাহায্যে ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য সুরু করতে পারে। সুতরাং কোনরূপ সাহায্য করা দূরে থাক লর্ড ওয়েলেসলী মিশনপ্রেস বন্ধ করা যায় কিভাবে তার চিন্তা করতে লাগলেন কারণ মিশনারীগণ কোনরূপ প্রচারকার্য চালালে আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করা তাঁর পক্ষে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে, মিশন প্রেস ডেনিস রাজত্বের সীমানায় থাকার দরুণ ইংরাজ রাজত্বের আইনের কোন মূল্যই সেখানে নেই। তিনি স্থির করলেন, ডেনিস গভর্ণর কর্ণেল বীকে প্রেসটী সত্বর বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানাবেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন [১] মহাশয়ের সময়োচিত হস্তক্ষেপে ও সহানুভূতিসম্পন্ন অনুরোধে লর্ড ওয়েলেসলী ক্ষান্ত হন এবং মিশন প্রেস সে যাত্রায় কোন মতে রক্ষা পায়।

আর্থিক দুরবস্থা থাকা সত্ত্বেও মিশন প্রেসের কাজ ধীরগতিতে চলতে থাকে, অর্থের সংস্থান হলে দ্বিগুণ উৎসাহে মুদ্রণকার্য্য চলে।

শ্রীরামপুরে মিশনপ্রেসে যখন বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ করে বাঙলা গদ্যের শিশু অবস্থার রূপ মুদ্রিত আকারে ধরে রাখা হচ্ছে তখন কলিকাতায় লর্ড ওয়েলেসলী অপর এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভিত্তি স্থাপনের জন্য কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তুমুল তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রচুর বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও লর্ড ওয়েলেসলীর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্বোধন হয়, কিন্তু শিক্ষাদানের কাজ সুরু হয় ২৪শে নভেম্বর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় যে উদার মনোভাব দেখিয়ে বহু পণ্ডিত ও বাঙলা ভাষার লেখকদের উৎসাহ দিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও অলিখিত রয়েছে।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তনী হবার প্রায় এক বৎসর পরে কেরী সাহেবের সঙ্গে কলেজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। রেঃ ব্রাউন এক পত্রযোগে কেরীসাহেবকে জানান যে বাঙলা ভাষার অধ্যাপকের পদটী লর্ড ওয়েলেসলী তাঁর জন্য সংরক্ষিত করেছেন এবং তিনি যেন অবিলম্বে ওই পদটী গ্রহণ করেন। কেরীসাহেব মিশনারী ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং বহু বিবেচনার পর তিনি রেঃ ব্রাউনের অনুরোধ রক্ষা করতে মনস্থ করেন। অতঃপর ১৮০১ সালের ৪ঠা মে, কলেজে বাঙলা ভাষার অধ্যাপকের পদটী অলঙ্কৃত করেন। কলেজে যোগদানের পশ্চাতে তাঁর চিন্তার মূলসূত্রগুলি এইরূপ ছিল—অধ্যাপকের পদটী গ্রহণ করলে মিশন প্রেসের প্রভূত উন্নতির সহায়ক হবে কারণ, প্রথমতঃ আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীভূত হবে, দ্বিতীয়তঃ কলেজের পাঠ্যপুস্তক অন্ততঃ বাঙলা বিভাগের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে তাঁর

১। রেভারেণ্ড ব্রাউন পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রোভোস্ট হন।

মতামতের একটা মূল্য থাকবে সুতরাং মিশন প্রেসের পণ্ডিতদের রচনার কিছু অংশ তিনি পাঠ্য হিসাবে নির্বাচন করতে পারবেন। শুধু তাই নয় যাবতীয় মুদ্রণের কাজ মিশন প্রেসে যাহাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে পারা যাবে যার ফলে কর্মব্যস্ততা বর্ধিত হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতাও আসবে। কেরীসাহেবের এই দূরদর্শিতা যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ, কেরীসাহেবের জন্য ৫০০ টাকা বেতন ধার্য্য করেন।

কেরীসাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করার পর মিশনপ্রেসের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মিশনপ্রেসে মুদ্রিত প্রচুর পুস্তক কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। যার ফলে প্রেসের কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় ও পরিধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। নানা ভাষায় প্রচুর পুস্তকের মুদ্রণ কার্য্য চলতে থাকে। শুধু প্রেসের উন্নতি নয় সমগ্র শ্রীরামপুর মিশনের সর্বাঙ্গীন অবস্থার উন্নতি হয়। একটী দলিলে দেখা যায় যে কেরীসাহেবের কলেজে যোগদানর কয়েকমাসের মধ্যেই মিশন কর্তৃপক্ষ ১০,৩৪০ টাকার বিনিময়ে প্রেসের পার্শ্ববর্তী চার একর জমি ও বাগান সমেত আর একটী বাড়ী ক্রয় করেছে।

মিশন প্রেস যখন উত্তরত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে তখন পঞ্চানন কর্মকারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নাগরী ভাষার একটী সাট তৈরী করেন এবং বাঙলা অক্ষরের যে প্রচলিত সাট ছিল তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অক্ষরের সাট কালীকুমার রায়ের হস্তাক্ষর অনুসরণ করে সম্পূর্ণ করেন।[১] পঞ্চাননের মৃত্যু মিশনের পক্ষে প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ হলেও তাঁর জামাতা মনোহর অপূর্ব কর্মদক্ষতার দ্বারা মিশনের অক্ষর নির্মাতার অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পঞ্চানন, জামাতা মনোহর ও মনোহরপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী এই তিনজনের প্রভূত পরিশ্রম ও অপূর্ব কর্ম্মদক্ষতার ফলে শ্রীরামপুরে বহুভাষার হরফের কারখানা বা টাইপ-ফাউণ্ড্রী গড়ে উঠেছিল যা জর্জ্জ স্মিথের মতে তখনকার কালে এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম বলে পরিগণিত হয়েছিল। ভারতের পনেরটি মুখ্য ভাষার এবং কয়েকটি বিদেশীয় ভাষার হরফ এমনকি চীনা হরফ পর্য্যন্ত এখানে ছাঁচে ঢালাই করা হত।

১৮১২ সালের ১২ই মার্চ্চ, বুধবার। ওয়ার্ড, মিশনপ্রেসের দপ্তরে তাঁর নিজস্ব টেবিলে বাৎসরিক হিসাবের কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। প্রাচ্য খণ্ডের বৃহত্তম ছাপাখানার হিসাবপত্র রাখার ভার ওয়ার্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ, কারণ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত অসংখ্য পুস্তক, পুস্তিকা, বাইবেলের নানাপ্রকার সংস্করণ ব্যতীত রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রং, লিপিমালা; গোলকনাথ শর্ম্মার হিতোপদেশ, রাজবলি; রজীব লোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং; চণ্ডীচরণ মুন্সীর তোতা ইতিহাস এবং কেরী-সাহেবের অসংখ্য রচনাবলী (যাহার বিষয় আলোচনা করতে হলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন), এইসব পুস্তকের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ফরমাইসি পুস্তকের মুদ্রণ হতে আরম্ভ করে বাঁধাই হয়ে কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয়ের জন্য যাওয়া পর্য্যন্ত সবকিছুর এবং ছাপাখানা চালাবার সমুদয় জিনিষ পত্রের দেখাশোনা অন্যান্য যাবতীয় কাজ সবই ওয়ার্ডের উপর ন্যস্ত ছিল অবশ্য মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারী ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁকে সাহায্য করতেন।

সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা, সারাদিন নিদারুণ গ্রীষ্মে গলদঘর্ম্ম হয়ে ওয়ার্ড হিসাবপত্র পরীক্ষা

১। কালীকুমার রায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হস্তলিপি শিক্ষক ও সেরেস্তাদার ছিলেন। রায় মহাশয়ের হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল এবং বাঙলা হরফের যে রূপ আজও বর্তমান তার মূল কাঠামোর জন্য আমরা রায় মহাশয়ের কাছে ঋণী।

করছেন, ঘরের মধ্যে আবছা আলোয় তখনও তিনি কাজ করে চলেছেন। মনোহর ছাড়া অপর সকল পণ্ডিত ও অন্যান্য কর্মীরা যে যার গৃহে ফিরে গেছেন। মিশনপ্রেসে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, ওয়ার্ড উঠে দাঁড়ালেন, জানলার বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন, বাতাসে কিছু পোড়ার গন্ধ পাওয়া গেল, মনোহরকে অনুসন্ধান করতে বললেন কিন্তু দক্ষিণ দিক ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড আগুনের শিখা কাগজের ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। ওয়ার্ড, দপ্তরখানা থেকে মার্শম্যানকে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন। মার্শম্যান তখন নিজগৃহে ছিলেন, তাঁর শিশু পুত্রটি আজ সকালে ইহধাম ত্যাগ করেছে তাই শোকগ্রস্ত পত্নী হান্নাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। ওয়ার্ডের ব্যাকুল চীৎকার শুনে সস্ত্রর মিশনপ্রেসে উপস্থিত হলেন ও ব্যাপার দেখে ধূলার উপর বসে পড়লেন। দমবন্ধ করা কালো ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে গেছে আগুনের তাণ্ডবলীলা সুরু হয়েছে প্রেসের ঘরগুলির মধ্যে।

এপারে অগ্নিকাণ্ডের ফলে গঙ্গার অপরপারে, ব্যারাকপুরে সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে। যারা নৌকা যোগাড় করতে পারেনি তারা ঘুমচোখে সেই আকাশছোঁয়া অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে রইল।

একজন বিশেষজ্ঞের উপদেশ অনুসারে মিশনপ্রেসের একটিমাত্র জানলা ব্যতীত সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। মনোহর অসহায়ভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন, তারপর সমূহ সর্বনাশের কথা চিন্তা করে ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মার্শম্যান ও ওয়ার্ড মনোহরকে কোনও রকমে সেই আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা করে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে এলেন ও শ্রীমতী মার্শম্যানের পরিচর্য্যায় মনোহর অচিরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে হতাশ হয়ে চেয়ে রইলেন। তাঁর বহুদিনের বহু পরিশ্রমে গড়া টাইপ-ফাউণ্ড্রি আজ ভস্ম হয়ে যাচ্ছে।

ওয়ার্ড একটি মই সংগ্রহ করে চালার উপরে উঠলেন, আগুনের প্রচণ্ড তেজে তাঁর সমস্ত শরীর ঝলসে গেল, তিনি চালার কিছু অংশে গর্ত্ত করে জল ঢালতে সুরু করলেন। মার্শম্যান তাঁর বোডিং স্কুলের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন, মিশনপ্রেসের আর কোন আশা নেই দেখে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের শয়নাবাসের চারিদিক পরিষ্কার করতে বললেন, কোন রকম দাহ্য পদার্থ যেন আশেপাশে না থাকে সেদিকে নজর রাখতে আদেশ দিলেন। স্কুলঘর থেকে যাবতীয় আসবাব ও বিছানাপত্র বাহিরে আনাবার ব্যবস্থা করে শ্রীমতী মার্শম্যানকে ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্বাবধান করতে বললেন। প্রায় চারঘণ্টার মত সময় জল ঢালবার পর আগুন স্তিমিত হয়েছে বলে মনে হ'ল কিন্তু কয়েকজন অবিবেচকের উপরোধে একটি জানালা খোলামাত্র প্রচণ্ডবেগে বাতাস প্রবেশ করে প্রায় নিভন্ত আগুনকে ঘিগুণ ভাবে প্রজ্জ্বলিত করে তুলল, ওয়ার্ড ও মিশনারী ভ্রাতৃবৃন্দ সকলে হায় হায় করে উঠলেন। প্রেসবাড়ীর দরজা জানালা, খড়ের চালা সব কিছুই প্রচণ্ডবেগে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। প্রায় সবকটি ঘরেই আগুন ধরে গেছে কিন্তু যে ঘরে মুদ্রাযন্ত্রগুলি আছে সেটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে।

আগুনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে মিশনপ্রেসকে রক্ষার আর কোনও উপায় নেই বুঝে, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান সবলে দপ্তরখানার জানালা ও দরজা ভেঙ্গে একটি আলমারী ও ওয়ার্ডের নিজস্ব টেবলটি বাইরে এনে দূরে রেখে দিলেন। সারা মিশনপ্রেসকে তখন আগুনের কুণ্ড বলে মনে হচ্ছে, বিরাট এক অগ্নিশিখা সশব্দে আকাশের দিকে উঠে চারিদিক লাল করে তুলেছে, মাঝে মাঝে কড়িকাঠ ও বাঁশ ফাটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সকলেই নিঃসহায়ভাবে সেই সর্বনাশের

দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ওয়ার্ড ও মার্শম্যান সকলকে স্থির হতে বললেন, মিশনপ্রেস রক্ষা করবার আর কোন আশাই নেই অতএব চাঞ্চল্যের কোন প্রয়োজন নেই। অনেকে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। অগ্নির সেই তাণ্ডবলীলার দিকে মিশনারীগণ সজল চোখে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় মিশনপ্রেসের লম্বা চালাটি সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল, ওয়ার্ড চমকে উঠে দাঁড়ালেন, মার্শম্যান ও অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দকে স্ব স্ব আশ্রয়স্থলে ফিরে যেতে বললেন।

পরদিন প্রত্যুষে, মার্শম্যান নৌকাযোগে কলকাতার পথে রওনা হয়ে গেলেন। কেরীসাহেব তখন ৩৪ নং বহুবাজারে মিশনের স্থায়ী আশ্রমে বসবাস করেন। মার্শম্যানের আকস্মিক উপস্থিতিতে কেরীসাহেব অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। মার্শম্যান কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

কেরীসাহেব এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনে প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেন তারপর বালকের মত উচ্চৈস্বরে রোদন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি, মার্শম্যান এবং পাদ্রী টমাসন, শ্রীরামপুরের দিকে যাত্রা করলেন। সন্ধ্যায় যখন তাঁরা মিশনের সীমানায় উপস্থিত হলেন তখনও ভস্মস্তূপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ওয়ার্ড, মনোহর এবং মিশনের অন্যান্য কর্ম্মীগণ যে স্থানে কাজ করা সম্ভব, সেই স্থানের জঞ্জাল সাফ করে কিছু উদ্ধারের আশায় কাজ করে যাচ্ছেন।

অতঃপর কেরীসাহেব, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান মিশনপ্রেসের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব প্রস্তুত করতে বসলেন। বহুক্ষণ পরে যে সম্ভাব্য হিসাব প্রস্তুত করা হ'ল নিম্নে দেওয়া গেল—

১) মুদ্রাযন্ত্রের ঘর ব্যতীত সমগ্র মিশনপ্রেসের বাড়ী ভস্মীভূত।

২) অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হবার এক সপ্তাহ পূর্বে ক্রীত এক হাজার চারশত রিম বিলাতী কাগজ এবং মিশনের নিজস্ব কাগজকলে প্রস্তুত কত টন কাগজ ভস্মীভূত হয়েছে তার কোন হিসাব নাই।

৩) পনেরটি ভারতীয় ভাষার এবং চীনা ভাষা সমেত অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার হরফ ও নূতন তামিল ভাষার হরফ নষ্ট হয়েছে যার গলিত ধাতুর ওজন প্রায় চার টন, এর সঙ্গে টাইপ-কেস ও আনুষাঙ্গিক মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হয়েছে।

৪) প্রচুর আসবাব পত্র ভস্মসাৎ হয়েছে।

এরপর যে ক্ষতির হিসাব ওয়ার্ড পেশ করলেন তা সম্পূর্ণভাবে কেরীসাহেবের ব্যক্তিগত ক্ষতি কারণ বহুবৎসরের অধ্যবসায় পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে সব পাণ্ডুলিপি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন সবই বিনষ্ট হয়েছে—

১) তেলেগু ব্যাকরণের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

২) বাইবেলের কয়েকটি বিদেশী ভাষার সংস্করণের পাণ্ডুলিপি।

৩) কেরীসাহেব ও মার্শম্যানের সম্পাদনায় এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত রামায়ণের চতুর্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি।

৪) কর্ণাট ভাষায় অনূদিত বাইবেলের একটি সংস্করণ।

৫) বাঙলা অভিধানের কিছু অংশের পাণ্ডুলিপি।

৬) সংস্কৃত ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি সংস্করণ।

৭) বাইবেলের পাঞ্জাবী সংস্করণ।

৮) বহুভাষা—শব্দকোষ (প্লট) পুস্তকের পাণ্ডুলিপি।

৯) আসামী, ওড়িয়া ও অন্যান্য ভাষার কয়েকটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি।

ক্ষয়ক্ষতির আনুমানিক মূল্য কত তার হিসাব তখন পাওয়া অসম্ভব বিবেচনা করে কেরীসাহেব ওয়ার্ডকে সম্পূর্ণ হিসাব প্রস্তুত করতে বললেন এবং যত শীঘ্র সেগুলি কলকাতায় পৌঁছায় তার দিকে দৃষ্টি রাখতে বললেন।

ইহা ব্যতীত, ক্যালকাটা বাইবেল অক্সিলিয়ারী কর্তৃক বাইবেলের তামিল ও সিংহলীয় ভাষার সংস্করণের ফরমাইস দেওয়া ৫০০ কপি ও অন্যান্য অসংখ্য মুদ্রিত পুস্তক পুস্তিকা ভস্মীভূত হয়।[১]

কিন্তু সব পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি বোধহয় কেরীসাহেবের, বাঙলা সাহিত্যে মহান অবদানের শীর্ষস্থানীয় হয়ে থাকত যদি অগ্নুনের গ্রাস হতে রক্ষা পেত। সেটি হল বহুভাষা-কোষের পাণ্ডুলিপি। ১৭৯৫ সালে মদনাবাটী সহরে থাকা কালে, কেরীসাহেব এই বহুভাষা-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে থাকেন এবং ১৮১২ সালে, এই দীর্ঘ ৭১ বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমে প্রায় শেষ হয়। পাণ্ডুলিপির মাত্র পাঁচটি খাতা কোনও ক্রমে রক্ষা পায়।[২]

এরপরে মিশনপ্রেসের পুনর্গঠনের কাজ নূতন উদ্যমে সুরু হল, গঙ্গার তীরে যে বড় বাড়ীটি কলকাতার পামার এণ্ড কোম্পানী নামে এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে লীজ দেওয়া হয়েছিল সৌভাগ্যক্রমে প্রায় একমাস পূর্বে তারা বাড়ীটা তাদের অপ্রয়োজনবশতঃ ত্যাগ করে, কেরী সাহেবের নির্দ্দেশে ওই বাড়ীটিতে মিশনপ্রেসের পুনঃস্থাপনা হয়।

ওয়ার্ড, মিশন প্রেসের দেশীয় কর্মীদের নিরাশ হতে নিষেধ করলেন, মনোবল দৃঢ় করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। সকলের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তিনি মনোহরকে বললেন যে কর্মীদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। পুনরায় একমাসের মধ্যেই পূর্ণোদ্যম মুদ্রণকার্য্য চলবার সম্ভাবনা রয়েছে। যে সব পণ্ডিত অনুবাদের কাজ করতেন তাঁদের সকলকেই সত্বর অনুবাদের কাজে মনোনিবেশ করবার জন্য অনুরোধ জানান হল। প্রায় চারটন ওজনের ধাতু যা আগে নানা ভাষার হরফ ছিল, সে-গুলি হরফ-ঢালাই মিস্ত্রীদের দেওয়া হল হরফ ঢালাইয়ের জন্য। যদিও কিছু সংখ্যক ঢালাইকার বরখাস্ত করা হয়েছিল কিন্তু তাদের বদলী কাজে নিযুক্ত করে প্রায় ত্রিশ দিনের মধ্যে মুদ্রণের কাজ সুরু করা হল। তামিল ও হিন্দুস্থানী ভাষায় নিউ-টেস্টামেন্টের মুদ্রণ চলতে লাগল। এপ্রিল মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ডের ছয় সপ্তাহের মধ্যে বাঙলা ও শিখ হরফের সাট তৈরী সম্পূর্ণ হল এবং ছয়মাসের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ডের পূর্বে যে সমস্ত কাজ মিশনপ্রেসে করা হত সেই সমস্ত কাজই পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল।

এক বৎসর পরে মিঃ ফুলারকে কেরীসাহেব এক পত্রে জানালেন যে বারমাসের মধ্যে মিশনপ্রেসের যে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা এককথায় অতুলনীয়। পূর্বাপেক্ষা অনেক সুবন্দোবস্তের মধ্যে মুদ্রণ কার্য চলেছে। অনুবাদের কাজে সর্বাপেক্ষা সুফল লাভ করা গেছে। সবচেয়ে দরুহ যে কাজ, সেই বাঙলা ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি পূর্ণোলিখিত হচ্ছে। তিনি আর একটী সুখবর মিঃ ফুলারকে জানালেন যে বাঙলা অভিধানের পাণ্ডুলিপি পুনরায় প্রস্তুত করছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রচুর চর্চা করা হচ্ছে এবং সেই সমস্ত ভাষায় পুস্তক মুদ্রণের কাজ সম্পূর্ণ প্রায়।

কেরীসাহেব, যিনি শ্রীরামপুর মিশন, মিশনপ্রেস, বোর্ডিং স্কুল, (যা পরে শ্রীরামপুর

১। কেরী সাহেব কৃত "ইতিহাসমালা" পুস্তকটীর অধিকাংশ অংশও সম্ভবতঃ বিনষ্ট হয়।

২। এই পাঁচটী খাতা শ্রীরামপুর কলেজের লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

কলেজে পরিণত হয়) এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ছিলেন তিনি যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন তা আজকের দিনে গল্পকথা বলে মনে হয়। সকাল হতে রাত্রে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কার্যক্রম এইরকম ছিল—"তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন পৌনে ছটায়, হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা করিতে সাতটা বাজিয়া যাইত। তারপর পরিবারস্থ সকলকে লইয়া বাঙলায় উপাসনা করিতেন। প্রাতরাশের পূর্ব পর্যন্ত ফার্সী মুনশীর সহিত ফার্সী পড়িতেন। প্রাতরাশের পর পণ্ডিতকে লইয়া রামায়ণের অনুবাদের কাজ চলিত, তারপর কলেজে গিয়া বেলা দুইটা পর্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রুফ দেখিতে হইত, তাহার পরিমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য আহার সারিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের সহায়তায় বাইবেল অনুবাদ করিতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিঙ্গা পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নটার সময় তিনি একাকী বাংলা অনুবাদে বসিতেন। রাত্রি এগারটার সময় গ্রীক বাইবেল এক অধ্যায় পড়িয়া তিনি শয়ন করিতেন। নিতান্ত অসুস্থ না হইলে তিনি এই ধরণের পরিশ্রম হইতে কখনও বিরত হইতেন না·····" (পৃঃ ১১৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। শ্রীসজনীকান্ত দাস)। দিনের পর দিন এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে বাঙলা গদ্য সাহিত্যের যে কাঠামো কেরীসাহেব গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন তা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে (অবশ্য অসম্পূর্ণভাবে)। কিন্তু সেই অক্লান্ত পরিশ্রমী, বিদেশীয় সুপণ্ডিত কেরীসাহেবের কথা এবং তাঁর অসামান্য সাহিত্যকীর্তির ইতিহাস বাঙলা ভাষায় আজও সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়নি।

মিশন প্রেসের অভূতপূর্ব কার্যক্রমের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ওয়ার্ড ও মার্শম্যান লিখিত চিঠিপত্র ও জার্ণাল, থেকে এবং কেরীসাহেবের চিঠিপত্রের মধ্যে শ্রীরামপুরে মিশনের কর্মপদ্ধতির কথা যা জানা যায় তা পর্যাপ্ত না হলেও ইতিহাসের উপকরণ সেই সব লেখায় প্রচুর ছড়িয়ে আছে। ১৮৩২ সাল পর্যন্ত মিশন প্রেস মোট দুইলক্ষ, বার হাজার খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিশাল কার্যক্রমে ওয়ার্ড ও মার্শম্যানের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত, যদিও ১৮২৩ সালে ওয়ার্ড পরলোক গমন করেন কিন্তু মার্শম্যান আজীবন মিশনপ্রেসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রণের যুগে নিজস্ব কীর্তির যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়।

আজ বাঙলা সাহিত্য মহাসাগরে পরিণত, কিন্তু মিশনপ্রেসের অগ্নিকাণ্ডে যে অসামান্য ক্ষতি হয়েছিল তার পূরণও হয়েছিল তথাপি আজও একটা অপূরণীয় হয়ে রয়েছে। সেটা হল কেরীসাহেব কৃত পলিগ্লট ডিকসেনারী বা বহুভাষা-কোষ। সংস্কৃতকে মূল ভারতীয় ভাষা হিসাবে গণ্য করে অন্যান্য বারোটী প্রাদেশিক ভাষায়, যথা —১। বাঙলা, ২। কাশ্মীর, ৩ জালন্ধর ৪। মধ্যদেশ, ৫। পার্বতী, ৬। মিথিলা, ৭। উৎকল, ৮। মহারাষ্ট্র ৯) কর্ণাটক ১০) গুর্জর ১১ তৈলঙ্গ, ১২। দ্রাবিড়, এই মোট তেরটী ভাষার শব্দকোষ, কেরীসাহেব ১৭ বৎসরের প্রভূত পরিশ্রমে সম্পাদন করেন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই যে তিনি এই মহাসম্পদ মুদ্রিত পুস্তকাকারে আমাদের জন্য রেখে যেতে পারেননি সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এই বহুভাষা-কোষটি বিনষ্ট হয়, এবং পরে তার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেন নি।

সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের পরিহাস এই যে, বহুভাষা—কোষ পলিগ্লট ডিকসেনারী সম্পাদনায় আজও কেহ হস্তক্ষেপ করেছেন কিনা তা জানা নেই। ১৮১২ সালের মার্চ্চমাসের অগ্নিকাণ্ডে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তার পূরণ কবে সাধিত হবে, কেরীসাহেবের মত ব্যক্তিত্ব আবার করে আমরা লাভ করব তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

গণিতের দর্পণে মিশর

মুরারি ঘোষ

গণিতের সংগে সমাজের যে সম্পর্ক-তার সত্যকার রূপউদ্ঘাটন, দু এক কথায় সারা যায় না। সাধারণ শিল্প সংস্কৃতির অন্যতম বিষয়বস্তু হিসাবে গণিতের সহজ মূল্য নিরূপিত হয় না। বিভিন্ন কার্য কারণ যোগে বিভিন্ন মানসিকতার আকাশপটে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সংগীত ও বিশেষ বিশেষ সামাজিক চেতনার ভাবাদর্শে গণিতের নানান দিকের রূপবিন্যাস বাস্তব রূপলাভ করেছে। বিশেষ করে পৃথিবীর আদিমতম গণিতের জন্ম ও বিকাশ বাস্তব পৃথিবীর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীভূত। একমাত্র লৌকিক প্রয়োজনে তার জন্ম, চর্চা ও প্রগতি। আর তা হল মানুষের সরল অভিজ্ঞতার সৃষ্টিমূলক প্রয়াস। ব্যাবীলন, মিশর, গ্রীস, ভারত ও আরব পরিক্রমার পর আধুনিক গণিত-রাজ্যে যে অনুপম ও জটিলতর শৃঙ্খলা তাও কিন্তু লৌকিক প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক হারায় নি। তার বর্তমান উদ্ভাবনা ও বিকাশে প্রাচীনতম সামাজিক সম্পর্কটি আজো বাস্তব। রূপবিন্যাসে যে পরিবর্তন আজ বর্তমান গণিতে সহজলক্ষ্য, তা প্রধানত বিষয়বস্তু গত হলেও গণিতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে তার আংগিকে। বিশেষ বিশেষ সভ্যতার আধারে গণিত যখন তার অগ্রগতির পথে দিক পরিবর্তন করেছে—সেই পরিবর্তনের মৌলরূপের অনন্য দর্পণে সমাজের উপরিতল প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলনের ছায়ায় সেই বিশেষ বিশেষ সভ্যতার রূপবিন্যাসও আলৌকিত হয়ে ওঠে। হগবেন কথিত সাধুবাক্যঃ গণিত হোল সভ্যতার দর্পন, (The minor of Civilization), গণিতের ইতিহাস পরিক্রমায় বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্যস্থল।

সভ্যতার দর্পনে মানুষের সাধারণ সংস্কৃতি, বিভিন্ন আবিষ্কৃয়া, অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা, নানান ধর্মমত, অজস্র ভাবসম্পদ নিয়ত প্রতিফলিত। তবু সমাজ ও সভ্যতার কৃষ্টিরূপের আলোচনা প্রসংগে গণিত-বিষয়ের অনিবার্য উত্থাপন পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ পর্যন্ত এড়িয়ে এসেছেন। অথচ সামাজিক কৃষ্টিরূপের আলোচনায় দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তৃত রূপলোক অজস্রবার উদ্ঘাটিত হয়েছে-শিল্প সাহিত্যের মর্মোদ্ঘাটন হয়েছে—অর্থনীতির স্থায়ী অস্থায়ী বিভাগ আলোচিত হয়েছে-বিভিন্ন বিজ্ঞান পরিশীলিত হয়েছে কিন্তু প্রবল অনীহা দেখা গেছে গণিতালোচনায়। অথচ গণিতের দর্পনেই সভ্যতা প্রতিফলিত, কেননা এখনও পর্যন্ত এও স্বীকৃত যে সমাজ ও সভ্যতার প্রগতি শুভবুদ্ধি নির্ভর। শুভবুদ্ধির মোহমুক্ত গণিতের চেতনা বিস্তারী আলোকে। নিবুদ্ধির নাগপাশ থেকে নানান দার্শনিক আলোচনার যখন তার মুক্তি ঘটে তখনই সে মুক্তির পেছনে যে বাস্তবতা তা গণিতিক অবরোহে (Deduction) আপন লক্ষ্যে উপনীত। তবু গণিতের প্রতি এই যে স্বাভাবিক নিস্পৃহা 'মরিস ক্লাইন' তা স্বীকার করেই বলেছেনঃ "প্রায় সকল লোকেই জানে, যন্ত্র বা স্থাপত্য পরিকল্পনার বিশেষ ব্যবহারিক প্রয়োগে গণিত নিযুক্ত। কিন্তু খুব অল্পলোকে যা জানে তা হোল, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের মূল বস্তুভার বহন করে গণিত এবং সমগ্র বস্তু প্রধান তত্ত্বগত সংগঠক হোল গণিত। এবং আরো স্বল্পতর লোকে জানে যে গণিত অধিকাংশ দর্শনের বিষয়বস্তু ও গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছে, বিভিন্ন ধর্মমত গঠন করেছে, ধ্বংস করেছে। অনেক অর্থনৈতিক তত্ত্ব এমনকি রাজনৈতিক তত্ত্বে উপকরণ জুগিয়েছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও স্থাপত্যকলার রূপলোক গঠনে

সাহায্য করেছে এবং বস্তু জগতের ও মানব প্রকৃতির প্রাথমিক প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দানে যথাযথ প্রেরণা সঞ্চার করেছে।" (ম্যাথামেটিকস্ ইন্ ওয়েস্টার্ন কালচার : মরিস্ ক্লাইন)

মনে হয় কী মরিস ক্লাইন অত্যুক্তি করেছেন? ক্লাইনের বক্তব্য অত্যুক্তি মনে হলেও গভীর ভাবে সত্য। কারণ, গণিতের প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞার মূল বক্তব্য যাই হোক না কেন গণিতের সংগে সমাজের সম্পর্ক মোটেই জটিলতর তত্ত্ব সমন্বিত নয়। সমাজ প্রগতির মূল প্রেরণা হিসেবে মুক্ত বুদ্ধির সরল সূত্র অবশ্যই অস্বীকার করেন না কেউ। তবু গণিতের জটিলতায় পথ হারানোর কারণ, কেননা তার বিষয়বস্তু ক্রমে ভারী হয়েছে—জটিলতর বুদ্ধি নির্ভর হয়েছে তার মূল প্রসংগ। তবু আংগিকের বদল ঘটলেও গণিতের বক্তব্য বিচারের পদ্ধতি তার মৌল স্বরূপ অবিকৃত রেখেছে। স্বচ্ছ যুক্তির পর্যাবিন্যাসে গণিতের একমাত্র নির্ভরতা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমাধান রহস্যে, বা স্থাপত্যশিল্পে গণিতের প্রত্যক্ষ প্রয়োগে আমরা নিত্য পরিচিত। তাই সামাজিক কৃষ্টি রূপের পরিবর্তনে বা সমাজের সামগ্রিক রূপবিন্যাসে গণিতের প্রভাব আমাদের সাধারণ দৃষ্টি সীমার অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বক্তব্য মরিস ক্লাইন আরো সরল করে তুলে ধরেছেন : গণিত যে আধুনিক সভ্যতার রূপায়নে এক প্রধান হাতিয়ার কিংবা বর্তমান সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণবস্তু—এ তত্ত্বের সবটা অবিশ্বাস্য কারণ না হলেও অনেকের কাছে বিশেষ অত্যুক্তি বলেই মনে হয়। এই অবিশ্বাসের কারণ দুর্বোধ্য নয়, কেননা গণিত-স্বরূপের ভুল ধারণা থেকেই এদের উৎপত্তি। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক জ্ঞানে গণিতের যে ধারণা বিকশিত তাতে গণিতকে দেখানো হয়, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা অর্থনীতিবিদের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসেবে। এই ধারণায় শিক্ষার প্রতিক্রিয়া হোল গণিতের ওপর এক বিশেষ বীতরাগ এবং অবহেলা। গণিতের বিষয়বস্তু কোনমতেই বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির সমবায় নয়। আসলে গণিতকে যদি কেবলই পদ্ধতি বলা যায় তা হোল সেই গণিত, যার মধ্যে যুক্তি নেই, লক্ষ্য নেই, সৌন্দর্যও নেই।"

একদা যুক্তি হীন, রূপহীন, বৈশিষ্টহীন গণিতের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীতে। সেদিন ছিল চেতনার উষালোক। কেবলমাত্র বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতায় তার সীমা। চিন্তায়, মননে, সুযুক্তি প্রয়োগে সেদিন গণিতের মুক্তি ঘটেনি যুক্তিবাদের রাস্তায়। আজকের সামাজিক প্রগতি সেদিনের গণিতের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারা যায় নি। চেতনার উষালোকে মানুষ যে গণিতের চর্চা করেছে সে গণিতের প্রসংগ ও উপকরণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অত্যাবশ্যক অংগ ছিল। গণিতের এই প্রয়োগ এখনো সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্মে সেই ঐতিহ্য অনুসারী। অধুনা গণিতের আরো এক প্রভাব সক্রিয়। গণিতের বস্তু-প্রসংগে, অংগসজ্জায়, মানুষের চিন্তাসম্পদ অশেষ প্রভাবিত। গণিতের ইতিহাস মানুষের সুযুক্তি-সৌধ নির্মাণের ইতিহাস।

গণিতের বিকাশে সামাজিক প্রগতির সম্পর্ক কতখানি নির্ভরশীল তার জবর দৃষ্টান্ত মেলে মিশরীয় গণিত ও তার আনুসঙ্গিক যুক্তিবাদে (Rationalization)। গণিতের সংগে যুক্তিবাদের ধ্রুব সম্পর্ক। এবং একের উপর অপরের অসীম নির্ভরতা। কিন্তু মিশরীয় গণিতে মানসিক প্রজ্ঞা ও যুক্তিবাদের বিকাশের ধারা উল্লেখযোগ্য নয়। দৈনন্দিন জীবনের সরল অভিজ্ঞতায় বা মুক্তিচিন্তার ইন্দ্রিয় সম্পদে মিশরীয় গণিত গঠিত।

মাত্র অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মিশরীয় গণিতের সৌধ নির্মিত। সময়গনার সূচনায় জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ। আর সাধারণ সংখ্যাবিজ্ঞানের দৌলতে গঠিত পাটীগণিত, বীজগণিত ও বীজগণিতের সরল সমীকরণ। মিশরীয় গণিতে এই হোল সাধারণ অভিজ্ঞতা-নির্ভর সম্পদ।

Speculative চিন্তায় বা গাণিতিক বুদ্ধিবাদের ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যে মিশরীয় গণিত সম্পূর্ণাংগ নয়। গ্রীক বা ভারতীয় গণিতে চিন্তার সম্পদ অশেষ ঐশ্বর্যময়। তবুও মিশরের সরল গণিতের সাহায্যে বিরাট বিরাট পীরামিড নির্মান সাধারণ অভিজ্ঞতার সীমা স্পর্শ করেছিল। পীরামিড নির্মান আশ্চর্য অভিজ্ঞতা-নির্ভর। তবু বিশেষজ্ঞদের মতে এই অত্যধিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুনির্ভরতা গণিতের দৈন্য বিশেষ। গণিতের বিশাল ও মহৎ ব্যঞ্জনার প্রসাদ মিশরীয় চিন্তাধারাকে স্পর্শ করেনি। গণিতজ্ঞ ক্লাইনের অভিমত : "মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ও সুযোগ সন্ধানে মিশর ও ব্যবীলনের গাণিতিক অনুসন্ধিৎসা সক্রিয় ছিল। গণিতের ভাবাগত সম্পদে তাদের যেমন প্রবেশলাভ ঘটেনি তেমনি কোন মৌলিক চর্চায় তারা গণিত-চিন্তা সমৃদ্ধ করতে পারে নি। বিশেষ কোন অবস্থার প্রয়োজনে, কোন কোন প্রশ্নের জবাব তারা গণিতের সহজ সূত্র আর প্রাথমিক নিয়মকানুন রচনা করেছিল। আসলে গণিতের সামান্য উন্নতি বিধান কিংবা কোন সাধারণ গাণিতিক নিয়মের প্রবর্তনায় তারা তৎপর ছিল না" (ম্যাথামেটিকক্স ইন্ ওয়েস্টার্ন কালচার : ক্লাইন)।

গণিতের মহৎ ব্যঞ্জনার প্রসাদে মিশরীয় চিন্তা পুষ্ট নয়। গাণিতিক অভিজ্ঞতার (Mathematical empiricism) স্তর পেরিয়ে বুদ্ধিবাদের মুক্ত রাস্তায় মিশরীয় গণিতের প্রগতি ঘটেনি। এমন কি উল্লেখযোগ্য-দার্শনিক চিন্তার বিকাশও ঘটেনি। গণিতের প্রগতির সংগে চিন্তার সম্পদ-বুদ্ধির নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে। মিশর-বিশেষজ্ঞেরা যখন বলেন যে প্রাচীন মিশর অসম্পূর্ণ বিকাশের মধ্যস্তর অতিক্রম করতে পারেনি তখন বিশাল পীরামিডের মহৎ কীর্তি সত্ত্বেও মিশরীয় চিন্তা-সম্পদের চরিত্রে সচেতন হতে হয়। সভ্যতার প্রথম বিকাশের অতুলনীয় সম্পদে আমাদের নির্বাক বিস্ময় কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু ধর্মগত ও সামাজিক ট্যাবুর কবলে পড়ে মিশরীয় সভ্যতার প্রাণান্ত। এবং এই অসম্পূর্ণ বিকাশের তত্ব থেকে আমরা এক স্বীকৃত সামাজিক তত্ত্বের সরলীকরণে সায় দিতে পারি : 'গণিত থেকে বুদ্ধিবাদের জন্ম—স্বচ্ছ যুক্তির উন্মোধন। পৃথিবীর সামগ্রিক কৃষ্টিবিকাশের এই হোল ঐতিহাসিক ধারা'। গ্রীস ও ভারতের এইএকই ঐতিহ্য এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনেরও। কিন্তু ঐতিহাসিক 'মানুচিপ-হোয়াইটে'র ভাষায় : "মিশর অধিবাসীরা যুক্তিশাস্ত্রে কিংবা চিন্তার সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ সতর্ক ছিল না। আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানে যা অপরিহার্য সেই কার্য-কারণ সূত্রজ্ঞানে তাদের স্বল্পতম অভিজ্ঞতা ছিল মাত্র।"

মিশরে তাই জ্যামিতির উদ্ভাবনা হলেও যুক্তিবাদের উন্মোধন হয়নি। পীরামিড নির্মান হলেও পীরামিডের কাজ নির্মিত হয়নি। গণিতের উন্মোধন হলেও দর্শনের আবির্ভাব হয়নি। মিশরীয় জীবনের এ একপরম দৈন্য। ঐতিহাসিকদের মতে সভ্যতার এক অসম্পূর্ণ বিকাশ।

গ্রীকবিজয়ের আগে তিনহাজার বছর ধরে একই চিন্তাসম্পদে আত্মতৃপ্ত ছিল মিশরীয় মানস। আসলে মিশরীয় জ্ঞানসম্পদ আদিম পৃথিবীর যাদুপ্রভাব থেকে তখনও মুক্ত হতে পারেনি। প্রাচীন পৃথিবীর প্রথম কৃষ্টিকলার জন্ম হয়েছিল যুক্তিবিহীন ম্যাজিক অনুশাসনে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান আহরণ করেই আদিম পৃথিবীর মানুষ পরিশ্রান্ত। এর ওপর যদি জীবন ধারা এমনি নিয়ন্ত্রিত হয় যেখানে তার স্বাভাবিক চিন্তাবিকাশে প্রয়োজনীয় সুযোগের যথেষ্ট অভাব ঘটে তবে সেখানে চিন্তার রাজ্যে প্রগতি অলৌকিক প্রত্যাশা মাত্র। মিশরীয় মানস বিশিষ্ট চিন্তাধারা বিকাশে কঠিনবাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক পরিপূর্ণ আত্মসন্তুষ্ট জীবন যাপন। অজস্রদাক্ষিণ্যেভরা নীল-নদের জল। প্রাচুর্য, সম্পদে, মিশরীয় সাধারণজন চিন্তামুক্ত। এমন কি জীবন বিকাশে সামান্য জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অনুভূত হয়নি। মিশরীয় জ্ঞানরাজ্যের একছত্র অধীশ্বর ছিল তার পুরোহিত সম্প্রদায়। জ্ঞানের সাধারণীকরণে তাদের প্রবল অনীহা। বিদ্যার অধীশ্বর হিসেবে, সামান্য মানুষের চোখে তাদের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সাধারণের

দৃষ্টিতে দেববংশসম্ভূত এই মানবগোষ্ঠী। মিশরের মানুষের আধ্যাত্মিক ও চিন্তাজগতের দায় নিশ্চিতভাবে এই পুরোহিত তন্ত্রের উপর অর্পিত ছিল। এই নির্বিরোধ জীবনের চিত্র দিয়ে এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেন : "নির্বাক পাথর আর শুকনো প্যাপীরাস পুঁথি ঘেটে আমরা সেই প্রাচীনধারণার সাক্ষাৎ পাই—'খাও দাও আর আনন্দকর'—সুখান্বেষী জীবনের এই ভয়াবহ দর্শন আদিম কাল থেকে গ্রীকবিজয় অবধি মিশরে চালু ছিল। বলা চলে মিশরীয় জীবনে সহজাত ছিল এই লঘুচিন্তা। (ভাইগালঃ দি গ্লোরী ফারাওস্)"।

জীবনের যে আসল সংগ্রাম, জীবিকার্জন, তার দুর্ভাবনামুক্ত ছিল মিশরীয় সাধারণ জন, আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ত অতিরিক্ত শাসনের মধ্যে থাকলেও বা সামাজিক অনুশাসন ও নিষেধাজ্ঞার বোঝা দুর্বহ হোলেও অর্থনৈতিক জীবন যাত্রায় পুরোহিতগোষ্ঠী বা মিশরীয় সম্রাট ফারাও কেহই হাত দেন নি। প্রতিটি মিশরীয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি, উর্বরভূমিতে অঢেল শস্য সম্ভার আর নিরাবেগ নিশ্চিত জীবন। তাই পুরোহিত তন্ত্র আর ফারাও এর উপর মিশরীয়দের অসীম নির্ভরতা। তাদের ক্ষমতায় ছিল অগাধ বিশ্বাস। সাধারণ মানুষের উপর এই অপরিসীম প্রভাব বিস্তারের মধ্যে আদিম পৃথিবীর ম্যাজিকের উপস্থিতি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা চলে। যুক্তিহীন ম্যাজিকের প্রভাব অনুভূত হয় মিশরীয় জনসাধারণের মানসিক অনুর্বরতায়। শিক্ষা ও অধ্যাত্মজীবনের দায় থেকে মুক্তি, আহৃত জ্ঞান সম্পদ থেকে দূরে থাকার নীতি, আর দৈনন্দিন জীবন যাপনের সহজআনুকূল্যে নিশ্চিন্ত নিরাবেগ জীবনের চার্যাকীয় অতিসারল্য তাদের জীবনে বিষক্রিয়ার কাজ করেছে। সুখীস্বচ্ছল আয়েসী জীবনে তাই গভীর চিন্তার কোনোস্থান ছিল না।

কিন্তু সাধারণ জীবন প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সংকীর্ণ অবস্থিতি কোনদিনই স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। ইতিহাসে বরাবর এই অস্বাস্থ্যকর জ্ঞানের পরিবেশ পরিশেষে মানুষের সামগ্রিক অমংগল ডেকে এনেছে। এমন কি অতিসহজ জীবন-সংকটে মানুষ পরাজিত হয়েছে, স্বচ্ছ জ্ঞান, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও মুক্তিবুদ্ধির অভাবে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমাদের আহৃত জ্ঞান যথেষ্ট ক্রিয়াশীল-এই ক্রিয়াশীলতাই জীবন গতিময় রাখে। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে মুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছ-রাস্তায় আবেগময় জীবনের আহ্বান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আরো মহত্তর জীবন জিজ্ঞাসায় জীবন সাধনায় 'হগবেন', উচ্চারিত এই সাবধানবাণী জাতীয়জীবনে সদা-স্মরণীয় : "গণিতের অনুশীলনে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে যখনই কোন জাতির বিশেষ কৃষ্টি সম্পদ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এক নিষ্কর্মা সামাজিক শ্রেণীর অলস চর্চায় পরিণত হয় তখনই তা ধর্মগত-চাতুরী কিংবা কোন অসংস্কৃতি বিদ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তাস্বাতন্ত্র্যে গর্ববোধ করা কিংবা গণশিক্ষার সামাজিক দায়িত্বে অবহিত না হওয়ার মত মূর্খতা এবং দুরাচারের তুলনা নেই। কেননা এর ফলেই জ্ঞান বিকাশের দুয়ার সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।" ম্যাথামেটিক্স ফর দি মিলিয়নস : ল্যান্সেলট হগবেন)

একদা মিশরীয় কৃষ্টি জগতের নির্মম সমাধি ঘটেছিল। তার রুদ্ধ সামাজিত প্রগতি গণিত প্রবর্তিত স্বচ্ছ যুক্তি ও মুক্তি বুদ্ধিবাদের সংগে সম্পর্কহীনতার কথাই ঘোষণা করে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তায় সীমাবদ্ধ গণিতের প্রসার মিশরীয় কৃষ্টি-সৌধ যেমন নির্মাণ করেছে আবার নিষ্ক্রিয় করেছে তার স্থায়িত্ব দান চেষ্টায়। উন্নত শিল্প সাহিত্য মিশরেও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দর্শন গড়ে ওঠেনি, সংস্কৃতি জগতের পুষ্টি যে রস-চেতনায়, তার একান্ত অভাব ঘটে গণিতের রুদ্ধ প্রসারের বিষ ক্রিয়ায়। মিশরীয় গণিতের দর্পণেই প্রাচীন মিশরীয় সমাজ দেহের নির্মম কাঠামো প্রতিফলিত।

শতাব্দীর ঋণ ও দায়িত্ব

কবি সম্মাননা বাংলার সহজাত ঐতিহ্য। বাংলাদেশ রাজাকে যে-মর্যাদা দেয় নাই, দেশের কবিকে তাহাই দিয়াছে। বাংলার কবি-স্মৃতিপূজা বাঙালীর জাতীয় জীবনের অংগবিশেষ। যুগে যুগে দেশের সাধারণ মানুষ আপন চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি দেশের কবির উদ্দেশে যে ভাবে অর্পণ করিয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বীরভূমের কেন্দুলির মেলায় জয়দেব অমর হইয়াছেন, গঙ্গার তীরে, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, গৃহস্থের গৃহকোণে প্রতি সন্ধ্যায় নিত্য রামায়ণ পাঠের মাঝে কৃত্তিবাস অমর হইয়াছেন, পথে প্রান্তরে, ষ্টেনে স্টীমারে অন্ধ ভিক্ষুকের কণ্ঠের গানের মাঝে রামপ্রসাদ অমর হইয়াছেন। পাঁচশো বছরের উপর প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে অজয়নদের তীরে কেন্দুলির অক্ষয় বটের তলে যে-মেলা বসিতেছে তাহার পিছনে সরকারী কর্তৃত্ব নাই, কোন 'কমিটি'র অভিভাবকত্ব নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ন যুগে যুগে ধরিয়া কণ্ঠে কণ্ঠে আবৃত্ত হইতেছে, গ্রামে গ্রামে জনশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হইয়া রহিয়াছে, দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে সজীব রাখিতেছে—ইহার পিছনে কোন পরিকল্পনা বা প্রচারের প্রয়োজন হয় নাই। রামপ্রসাদী সুর কয় শতাব্দী ধরিয়া বাংলার মানুষকে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। একতারায় খঞ্জনীতে সামান্য টুং টাং আওয়াজ হইতেই পথচারী মানুষ তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারে রামপ্রসাদের সুর—ইহার চেয়ে কোন অমরতা সুরকার কামনা করিতে পারে? বাংলাদেশ ইহাদের সম্মান দেখাইয়াছে প্রস্তরের মূর্তি গড়িয়া নয়, রাজপথের নাম রাখিয়া নয়, পাথর কংক্রীটের স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করিয়া নয়। ইহাই স্থায়ী স্মৃতিরক্ষা, সার্থক সম্মান।

বাংলাদেশ যে-ভাবে এই তিনজন কবিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে আজ বারবার তাহা স্মরণ করিবার কারণ আছে। আজ আমাদের শতাব্দীর ঋণ-স্বীকার করিবার লগ্ন আসিতেছে। বাঙালী আজ তাহার শ্রেষ্ঠকবির স্মৃতিরক্ষার কথা চিন্তা করিতেছে, তাহার জন্য নানা উদ্‌যোগ আয়োজন শুরু হইয়াছে। সেই প্রসংগে জয়দেব-কৃত্তিবাস-রাম প্রসাদের কথা স্বতঃই মনে আসিবে। ইহাঁদের ক্ষেত্রে একটি জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্মৃতি রক্ষার দায়িত্ব নিয়াছে বৃহত্তর সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচীর সহিত কবিকে মিশাইয়া লইয়াছে, তাহার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত কবিস্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিয়া গিয়াছে। কবিস্মৃতিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কর্মসূচীর সহিত এবং তাহার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত মিলাইয়া না দিলে সাধারণ মানুষ কবিকে মনে রাখিবে কেন? কবি কোনপথে সাধারণ মানুষের জীবনে ছড়াইয়া যাইতে পারেন তাহারই সন্ধান করিতে হইবে। রাজধানীতে রাজধানীতে ভবন তুলিয়া, কমিটি বানাইয়া, স্মারক গ্রন্থ ছাপিয়া রবীন্দ্রনাথকে অমর করা যাইবে না। মূর্তিতে, স্মৃতি সৌধে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ অমর হইয়া থাকিবেন না, তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রহিল শান্তিনিকেতনে মহর্ষি প্রবর্তিত সাতই পৌষের মেলায়। পৌষমেলা পারিপার্শ্বিক জনজীবনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃ-

তিক ক্ষেত্রে যে-স্থান করিয়া লইয়াছে তাহাতে মনে হয় বীরভূমের সাঁওতালেরাই দেশের কবিকে অমর করিয়া রাখিবে।

এই সকল কথা ভূমিকায় সবিস্তারে বলিবার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে কোন কিছু করিতে যাইবার পূর্বে চিন্তা করা প্রয়োজন কীভাবে কবিস্মৃতিকে জনজীবনের দৈনন্দিন কর্মসূচীর মাঝে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া যাইবে। এই দৃষ্টি লইয়াই কয়েকটি কর্মসূচী নিবেদন করা হইতেছে—এই দিকে উৎসাহ জাগ্রত হইলে বারান্তরে এই জাতীয় আরও প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রস্তাব বাৎসরিক বৈশাখী মেলা। প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ হইতে পঁচিশে বৈশাখের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে মেলার আয়োজন করা হোক। গ্রামাঞ্চলে মেলার প্রস্তাব করা হইতেছে দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, শহরে মেলা হইলে বৃহত্তর জনজীবনের সহিত সংযোগের সম্ভাবনা নাই, দেশ শহরে নয়, গ্রামে। দ্বিতীয়তঃ শহরের মেলা ইণ্ডাস্ট্রিজ ফেয়ার বা দিল্লীর মথুরা রোডের মেলায় পরিণত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ইহারা নামেই মেলা। গ্রামের মেলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ইহার স্বতঃস্ফূর্ততা। আপন নিয়মে ইহা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। বাংলার অগণ্য গ্রামের চরক মেলা, রথের মেলা, মাঘীপূর্ণিমার মেলা, পীরের মেলা রাসের মেলা দেশের মেলার ঐতিহ্য বহন করিতেছে। বৈশাখী মেলা শুধু ১৯৬১ সালের একবছরের মেলা হইবে না, প্রতি বৎসরের স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হইবে, ইহাই আশা। মেলা কীভাবে হইবে, তাহার ব্যবস্থা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। এই মেলা গ্রামীন চরিত্রকে নষ্ট করিবে না। সভাপতি ডাকিয়া ফিতা কাটিয়া ইহার উদ্বোধন হইবে না। প্রতি সন্ধ্যায় তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব জলাশয় প্রতিষ্ঠা। সরকারী আনুকূল্যে শহরে (এবং গ্রামাঞ্চলেও !) স্মৃতিভবন নির্মাণের প্রস্তাব রহিয়াছে। এই ভবন কতখানি কবির স্মৃতি বহন করিবে, কতখানি জাতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র হইবে জানি না (মহাজাতি সদনের দিকে চাহিয়া বিশেষ আশা হয় না)। শহরে যাহাই হউক, গ্রামাঞ্চলে এই ভবন নির্মাণের মোহ যেন সঞ্চারিত না হয়। ইহার পরিবর্তে সরকারী অর্থানুকূল্যে দিঘি খননের চেষ্টা করা হউক। দিঘি গ্রামজীবনের এক অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ আমাদের গ্রামাঞ্চলে জলাভাবের কথা সর্বজনবিদিত। দিঘি ব্যয়বহুল মনে হইলে কূপ বা নলকূপ প্রতিষ্ঠাও করা যাইতে পারে। উৎসাহ থাকিলে শ্রমদানের ভিত্তিতে সরকারী অর্থানুকূল্যে নিরপেক্ষস্বল্প খরচে দিঘি খনন করা যাইতে পারে। এন-সি-সি, এ-সি-সি প্রভৃতি যুব প্রতিষ্ঠানগুলি আগামী একবছর বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। জলাশয় প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন নানা প্রবন্ধে, পত্রে, বক্তৃতায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জলাভাবের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন সায়াহ্নে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া অসহায় শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। কবির শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে জলাশয়-প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ কবির আত্মাকে নিশ্চিত তৃপ্তি দিবে। জলাশয় খনন করিতে পারিলে তাহার চারিপাশে বৈশাখী মেলারস্থায়ী স্থান গড়িয়া উঠিতে পারে।

তৃতীয় প্রস্তাব, বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রবর্তন করা হউক। বৃক্ষরোপণ কবির বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান। শান্তিনিকেতনে কবির মৃত্যুদিন বাইশে শ্রাবণ বৃক্ষরোপণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৃক্ষরোপণ ভারতীয় প্রাচীন উৎসবধারার ঐতিহ্যবাহী। কোনমঙ্গল উৎসবে বৃক্ষরোপণ আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। বৈশাখের খরতাপ বৃক্ষরোপণের পক্ষে সুপ্রশস্ত

না হইলেও, এই অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়া দেখা যাইতে পারে। দিঘির চারদিকে বা মেলাপ্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ উৎসব করা যাইতে পারে।

এইবার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ ও প্রচার। রবীন্দ্রনাথকে জানিতে ও শ্রদ্ধা করিতে গেলে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ অপরিহার্য। রবীন্দ্রবাণীই দেশের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনন্য দান। দেশের সর্বত্র রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে, নিরক্ষর মানুষের মাঝে রবীন্দ্রবাণী প্রচার করিতে হইবে। যে দেশে এখনও শতকরা ৮০ জন অক্ষর জ্ঞানশূন্য, যেখানে শতকরা ৮৫ জন মানুষ কোনক্রমে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে, সেখানে সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলী বিক্রয় করিয়া দায়িত্ব পালন শেষ হইতে পারে না। স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র পরিচয় সভা স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহা কোন কমিটি ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। রবীন্দ্র পরিচয় সভাকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে একটি রবীন্দ্র গ্রন্থাগারও গড়িয়া উঠিবে। প্রথম অবস্থায় স্কুল কলেজে বা সাধারণ পাঠাগারের ভরসা করিয়া এই সভা কাজ শুরু করিতে পারে। এই সভা যাহাতে নিছক পাঠশালায় পরিণত না হয় তাহার জন্যও সচেতন থাকিতে হইবে। নিছক সাহিত্যপাঠের ক্লাশ বা পন্ডিতজনের রবীন্দ্রনাথের উপর বক্তৃতা সর্বদা লোভনীয় নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। রবীন্দ্র পরিচয় সভা প্রধানতঃ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই আগ্রহ সৃষ্টি করিবে, তাহাদের লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা গড়িতে হইবে। রবীন্দ্রবাণী প্রচারের জন্য গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া নানা ধরণের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কাজে খরচপত্র অতিসামান্য, তাহার জন্য বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। আসল প্রয়োজন উৎসাহ ও নিষ্ঠা।

এইবার তৃতীয় পর্যায়ে কয়েকটি খুচরা প্রস্তাব আলোচনা করা যাক। এইগুলি আপাত ভাবে সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও ইহার সুদূর প্রসারী ফল অবশ্যম্ভাবী। প্রথমতঃ,স্কুল কলেজে প্রকাশ্যস্থানে রবীন্দ্রবাণী আধার প্রতিষ্ঠা। এই বোর্ড বা আধারে কয়েকদিন অন্তর অন্তর নূতন নূতন রবীন্দ্রবাণী, চিত্র বা অন্য জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য বস্তু এই প্রদর্শিত হইবে। ইহা রবীন্দ্র বাণী প্রচারের অঙ্গ। এই বাণীচয়ন, অনুলিখন ও সংগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে নানা বিচিত্র উৎসাহ জাগাইতে পারে এবং এই সকল বাণী বৈশাখী মেলায় প্রদর্শিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নানা প্রতিযোগিতার প্রবর্তন। বর্তমানে রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে যে সকল প্রতিযোগিতা প্রচলিত তাহার বিশেষ কোন স্থায়ী প্রভাব নাই। একটিমাত্র কবিতা আবৃত্তিতে রবীন্দ্র সাহিত্যপাঠে আগ্রহ বাড়েনা, রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগও প্রকাশ পায় না। উপরন্তু ইহা কী বিষম একঘেঁয়ে সে বিষয় অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। রবীন্দ্রনাথের কোন বিশেষ দিক লইয়া প্রবন্ধ রচনাও রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের সার্থক পদ্ধতি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবন্ধগুলির মান বিশেষ উচ্চ হয় না এবং সেই উপলক্ষে রবীন্দ্র সাহিত্যের গভীর জ্ঞান আহরণের বিশেষ আগ্রহও দেখা যায় না। লেখকের রচনাচাতুর্যই মুখ্য হইয়া ওঠে। ইহার পরিবর্তে কয়েকটি অন্যধরণের প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের সাক্ষাৎকার সচিত্র প্রতিলিখন বা কপির প্রতিযোগিতা। ইহাতে সুন্দর হস্তাক্ষর, শোভন অলংকরণ ও সেই সঙ্গে অন্ততঃ একখানি কাব্যগ্রন্থের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন উপন্যাসের দ্রুত ও নির্ভুল প্রতিলিখনের প্রতিযোগিতা আহ্বান করা করা যাইতে পারে। ইহাতে সেই উপন্যাসের সহিত এক নিবিড় যোগ স্থাপিত হয় এবং ভাষাশিক্ষার ব্যাপারেও ইহার বিশেষ প্রভাব আছে। সম্প্রতি জনাব হুমায়ুন কবীরের আহ্বানে

শান্তিনিকেতনে কয়েকটি ছাত্র এই জাতীয় কাজ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন কোন একটি বিষয়ে (যথা : পল্লী সংস্কার, বিশ্বশান্তি বা উপনিষদ) রবীন্দ্রনাথের উক্তি সংকলনের প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতে পারে। যাহারা সংকলন সর্বাপেক্ষা সর্বাবৃত্ত (exhaustive) হইবে সেই প্রশংসার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে। এই সংকলনের জন্য প্রতিযোগীকে যে সমস্ত রবীন্দ্র রচনাবলী ঘাঁটিতে হইবে ইহা তাহার পক্ষে কম লাভ নয়। এইসব ক্ষেত্রে যোগ্য পথপ্রদর্শক থাকা আবশ্যক। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে নাটক রচনা বা কাহিনীমূলক কাব্য অবলম্বনে গল্প রচনার প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীর মৌলিক ক্ষমতাকে উৎসাহিত করিবে এবং ইহার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান শূন্য মানুষের মাঝে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রচারের এক ভিত্তি পাওয়া যাইতে পারে। তৃতীয় প্রস্তাব, আমাদের জীবনে বাংলা ব্যবহারের প্রসার সম্পর্কে। বিশেষতঃ স্কুল কলেজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক। সরকারী কাজে কর্মে বাংলাভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বহুদিন আলোচনা ও প্রচেষ্টা চলিতেছে। সরকার কবে করিবেন জানি না। তবে আমরা সরকারের অপেক্ষায় না বসিয়া থাকিয়া আমাদের স্ব স্ব গণ্ডীতে কাজ শুরু করিয়া দিতে পারি। স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ কাজ কর্ম এই মুহূর্ত হইতেই রীতিমত বাংলায় শুরু করিতে পারেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা কেবল বাক্যে নয় কর্মেও দেখাইবার সময় নিশ্চয়ই আসিয়াছে।

ইহা ছাড়া সভা অনুষ্ঠানে ভারতীয় ধারার অনুবর্তন এই কর্মসূচীর অন্তর্গত হওয়া উচিত। আমরা বহুকাল ধরিয়া অন্ধভাবে বিলিতি কায়দায় সভা অনুষ্ঠান চালাইয়া আসিতেছি। সভাপতি, প্রধান অতিথি, চেয়ার টেবিল—এইগুলি আমাদের অনুষ্ঠানের সহিত বেমানান এবং ব্যয়বহুলও বটে। আমাদের দেশীয়প্রথায় অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ সজ্জা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা প্রবর্তিত হইলে ব্যয়ও কমিবে রুচিও বাড়িবে।

প্রস্তাবের তালিকা আরও দীর্ঘ করা যাইতে পারে। এখানে মূলতঃ সরকারী উদ্‌যোগ নিরপেক্ষ কর্মসূচী যাহাই হোক না কেন, আমরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী এই কর্মসূচীর অনেকখানি গ্রহণ করিতে পারি। প্রায় সব কয়টিই উৎসাহ ও উদ্‌যোগ থাকিলে অনুষ্ঠিত করা সম্ভব, জলাশয় প্রতিষ্ঠাই একমাত্র ব্যয়বহুল প্রস্তাব। উৎসাহ থাকিলে শ্রমদানের ভিত্তিতে ইহাও অল্প খরচে করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ব্যয় বাহুল্যের পরিবর্তে উৎসাহ ও নিষ্ঠাই এই সকল প্রস্তাব সার্থকায়ণের ভিত্তি।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

বিচিত্রা : পূর্বানুবৃত্তি

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৩৯—আষাঢ় ১৩৪০

শ্রাবণ ১৩৩৯

বধূ-মঙ্গল

ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা শ্রীঅমিতা সেবীর শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত

পরিশেষ। বধূ

পারস্য ভ্রমণ

প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং ১৩৪০ বৈশাখ সংখ্যায় সমাপ্ত

জাপানে-পারস্যে

ভাদ্র ১৩৩৯

জরতী

পরিশেষ

বৃশেয়রে সম্বর্ধনার উত্তরে কবির ভাষণ

[১] আমার সম্বন্ধে আপনাদের [২] চিন্তাসমৃদ্ধ এই প্রাচীন দেশের

রবীন্দ্ররচনাবলী ২২, গ্রন্থপরিচয়

"প্রদোষ"

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র, 'আমার লেখায় 'প্রদোষ' শব্দের প্রয়োগে'। ২১ জুলাই ১৯৩২

অপ্রকাশিত

বাংলার বানান সমস্যা

শ্রীবিমলনারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত পত্র, 'বিদেশী রাজার হুকুমে' ১৬ শ্রাবণ ১৩৩৯

অপ্রকাশিত

স্বরলিপি : 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে'

স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরবিতান ১

আশ্বিন ১৩৩৯

পুকুর ধারে

পুনশ্চ

ছুটির আয়োজন

পুনশ্চ

চিঠি

'প্রদোষ' ও 'হলন্ত' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের পত্রের উত্তরে কবির পত্র,

'আবার একটা ভুল করেছি।' ২৩ আগস্ট ১৯৩২
অপ্রকাশিত

কার্ত্তিক ১৩৩৯

প্রসাদ ভবনে
শ্রীনন্দলাল বসুর চিত্রবৃন্দে এই কবিতা 'রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন।' সেই চিত্র
এইসঙ্গে মুদ্রিত।
বীথিকা। গোধূলি

ক্যামেলিয়া
পুনশ্চ

৪ঠা আশ্বিন
মহাত্মা গান্ধী
এই প্রবন্ধ ও পরবর্তী প্রবন্ধ 'মহাত্মাজীর শেষ ব্রত' ১৩৩৯
সালে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল

মহাত্মাজীর শেষ ব্রত
মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মাজীর পুণ্যব্রত

শরৎ-বন্দনা
শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মদিবসে রবীন্দ্রনাথের পত্র, 'সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগ'।
৩১ ভাদ্র ১৩৩৯
হস্তাক্ষরে মুদ্রিত
অপ্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ
শরৎচন্দ্রকে লিখিত পত্র, 'বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায়'।
অপ্রকাশিত

অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

দুই বোন
প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং ফাল্গুন ১৩৩৯ সংখ্যায় সমাপ্ত
দুই বোন

হার
হস্তাক্ষরে মুদ্রিত।
পরিশেষ, দ্বিতীয় সংস্করণ। নূতন কাল

পূর্ব্ব ভ্রমণ
মহাত্মা গান্ধী। ব্রত উদ্‌যাপন

পৌষ ১৩৩৯

পত্র-সংগ্রহ
১. 'অবাধ সন্তান-জননের যে দুঃখ'। নীলিমা দাসকে লিখিত পত্র। ২ নবেম্বর ১৯৩২
২. 'আজকাল আমার সময়ের'। ১৪ ফাল্গুন ১৩১৮
অপ্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্তত বৎসর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে। 'নানা কথা'
বিভাগে মুদ্রিত
অপ্রকাশিত

মাঘ ১৩৩৯

নূতন
শান্তিনিকেতনে বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন
অপ্রকাশিত

আশীর্বাদ
পরিশেষ, দ্বিতীয় সংস্করণ

সামাজিক বিচার
মতিলাল রায়কে লিখিত পত্র। 'প্রবাদ আছে, কথায় চিঁড়ে ভেজে না'। পৌষ সংখ্যা 'প্রবর্তক'
হইতে পুনর্মুদ্রিত
অপ্রকাশিত

ফাল্গুন ১৩৩৯

মুক্তি
পুনশ্চ, দ্বিতীয় সংস্করণ

চৈত্র ১৩৩৯

স্নান সমাপন
পুনশ্চ, দ্বিতীয় সংস্করণ

কল ও কারখানা
শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে লিখিত পত্র, 'এতদিনে বেঙ্গল কেমিকেলের'।
অপ্রকাশিত

বৈশাখ ১৩৪০

মানব সম্বন্ধের দেবতা
খৃষ্ট জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ।

খৃষ্ট

প্রত্যুত্তর
কবিতা। অপ্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

সাজ
বিচিত্রিতা

গল্প লেখার বন্ধু ও আর্ট
আশালতা সেবীকে লিখিত পত্র, 'তোমার এবং দিলীপের একখানি পত্র'। ১ মে ১৯৩৩
অপ্রকাশিত

আষাঢ় ১৩৪০

বিচ্ছেদ
বীথিকা।
বীথিকা গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতা বিচিত্রিতার মতো সচিত্র প্রকাশিত হইবে এইরূপ প্রস্তাব ছিল।

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত এই কবিতার চিত্র বর্তমান সংখ্যায় 'বিচ্ছেদ' নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

সপ্তম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৪০—আষাঢ় ১৩৪১

শ্রাবণ ১৩৪০

দুই বোন

পত্র, ২৭ মার্চ ১৯৩৩। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, গ্রন্থপরিচয়

ভাদ্র ১৩৪০

প্রার্থনা

পরিশেষ, দ্বিতীয় সংস্করণ

আশ্বিন ১৩৪০

মালঞ্চ

মালঞ্চ। উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এবং অগ্রহায়ণ ১৩৪০ সংখ্যায় সমাপ্ত।

মাঘ ১৩৪০

ঈষৎ দয়া

বীথিকা

ফাল্গুন ১৩৪০

বাতাবির চারা

'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের তিন সংখ্যক কবিতা তুলনীয়। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, শেষ সপ্তক: সংযোজন।

চৈত্র ১৩৪০

নন্দলাল বসু

অপ্রকাশিত

বৈশাখ ১৩৪১

একাকী

অপ্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

ইংরেজি গীতাঞ্জলি

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীকে লিখিত পত্র, 'গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কথা'। ৬ মে ১৯৩৩ চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড

স্বরলিপি : 'আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো'

স্বরলিপি। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

স্বরবিতান ৫৪

আষাঢ় ১৩৪১

স্বরলিপি : 'আমার আঁধার ভালো'

স্বরলিপি। শ্রীসাহানা দেবী

স্বরবিতান ৩

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

ভগবানের জন্ম

মানুষ জন্মায়; তার একটা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। সেই নিয়মেজন্মানোর মধ্যে কিছু অপরাধ নেই। যুগ যুগ ধরে শতাব্দী ধরে স্ত্রীপুরুষের মিলন থেকে শিশু জন্মাচ্ছে কি মানব জগতে, কি পশুর জগতে। প্রকৃতির একটি নিজস্ব নিয়ম আছে সেই নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নেই, যেখানে ব্যতিক্রম বলে মনে হয় সেখানে নতুনতর কোন নিয়মের রাজত্ব চলে বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ব না জানলেও এই মোটা কথাটা অনেকেই জানে যে সংসারে কোন কিছুই বেনিয়মে হচ্ছে না-হওয়াটা সম্ভব নয়।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার প্রথম যুগে মানুষ এই সত্যটা যখন সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি তখন একটা অজানা অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করে মানুষের বিহ্বলতা একটা আশ্রয় পেয়েছে। তারপর এই ধারণা ক্রমশ বাড়িয়ে দেবার লোকের অভাব হলোনা যে নিয়মকে যা লঙ্ঘন করে তাই হলো দৈবী—সেই দৈবীশক্তির লীলা যত অসম্ভব যত অদ্ভুত যত প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ ততই তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে লোকের মনোভাব সুদৃঢ় হতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে অতিপ্রাকৃতই দেবতা হয়ে উঠলো। তখন কার ধর্ম কত অলৌকিক, অবাস্তব ঘটনা কোন গুরুর জীবনে কত বেশী, গুরু ও ধর্মবিচারে তাই হলো মাপকাঠি।

মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি আর এই দৈবনির্ভর মূঢ় বিহ্বলতায় বার বার লড়াই লেগেছে। বার বার শাস্ত্রের আজগুবি নির্দেশ ত্যাগ করে মানুষ সৎবুদ্ধির দ্বারা প্রেম ও কল্যাণকে তার ধর্মবোধের মূল কথা বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। যাঁরা এ কাজ করেছেন তাঁদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিল তাই অবান্তর কাহিনীর চেয়ে প্রাণগত উপলব্ধির প্রতি তাঁদের পক্ষপাত বেশী ছিল। কিন্তু এই স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা মৃত্যুর পরে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন তাঁদের নির্বোধ মূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন শিষ্যদের হাতে যারা গুরুকে দেবতা বানিয়েছে, গুরুর ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে। গুরু যা তাঁকে সেইভাবে দেখলে তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান জানানো হবে-এ কথা তাদের বোঝা সম্ভব নয়, কারণ গুরুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার অভাবেই তারা কাহিনীর সৃষ্টি করে, গুরুকে ভগবান করে তোলে। যিনি সধর্ম পালনের দ্বারা বড় হন তিনি শিষ্যদের হাতের স্থূল অবলেপে মহিমাচ্যুত হয়ে বহুরূপী সঙে পরিণত হন। তিনি যে মানুষ এই কথাটা অস্বীকার করার জন্য কি প্রাণান্তকর প্রয়াস, তিনি যে দেবতার অবতার বা স্বয়ং দেবতা একথা বোঝবার জন্য নিবুদ্ধিতার কি আত্মঘাতী অহংকার।

খৃষ্টধর্মে বলা হয়েছে যীশুখৃষ্টের জন্ম কুমারী মাতা থেকে। তাঁর নাম ভারজিন মেরী, ইম্যাকুলেট কনসেপশন। এই জন্মের জন্য কোন পিতার প্রয়োজন হয়নি। যীশুখৃষ্টের প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা কোন খৃষ্টানের চেয়ে কম নয়। আমরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব বলে মানি যিনি প্রেম ও মৈত্রীর ধর্ম প্রচার করে মানুষের মহৎ জীবনের পথ দেখিয়েছেন কিন্তু তাঁকে সমস্ত রকম নিয়ম—ব্যর্থ করা ভৌতিক শক্তির ফসল বলে মানিনা। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রতিবাদীদের কাছে তাঁর মহত্ব প্রমাণের জন্য তাঁর শিষ্যবৃন্দ ঐ গল্পটির সৃষ্টি করেছেন। যে

মানবপুত্র মানুষকে সকল রকম অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁকে ঈশ্বরপুত্র প্রমাণ করার ব্যগ্রতায় এই অবাস্তব কাহিনীর রচনা এবং আশ্চর্য এই যে খৃষ্টান জনসম্প্রদায় যারা যীশুখৃষ্টের উপদেশে তিলমাত্র আস্থা স্থাপন করেনি তারা এই গল্পটিকে বিশ্বাস করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র। পাঠকের কাছে প্রমাণ্য অংশ তুলে দেওয়া গেল।

"When his mother Mary has been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Ghost. And Joseph her husband, being a righteous man and not willing to make her a public example was minded to put her away privily. But when he thought on these things, behold an angel, of the Lord appeared unto him in a dream, saying Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife; for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name Jesus".

যাঁর জন্মেরকাহিনী এই তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে আরও কত মিথ্যার স্তূপ জড়ো হয়েছে কে তার হিসাব রাখছে কিন্তু এটুকু বুঝেছি তিনি যা ছিলেন তার যথার্থ রূপ শঙ্কিত ভক্তচিত্তের মিথ্যাকথনের দ্বারা বহুলাংশে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মানুষের মস্তব্য কি সুদূর প্রসারী সে পরিচয় না দিয়ে ভগবৎপুত্রের যাদুকরত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। যাঁরা যুক্তিবাদে কোন আস্থা রাখেন তাঁরা অবশ্য কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় হিন্দু দর্শনে শুধু দেবতা হিসাবে নয় দর্শন তত্ত্বের উদ্গাতা বলেও তাঁর স্থান আছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতার—তাঁর জন্ম সুতরাং স্বাভাবিক মানবজন্মের অনুরূপ নয়। অবতার তত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এ দেশে। এ তত্ত্বে মানুষ বড় হয়ে দেবতা হয়না দেবতাই মানবকল্যাণের তাগিদে মানবজন্ম নেন—যিনি অনন্ত তিনি শান্ত হন। যাঁরা মুক্ত পুরুষ তাঁরা মানবতত্ত্বের দ্বারাই দেবত্বে উন্নীত তাঁদের মহাপ্রাণত্ব মানুষের আত্মিক শক্তির পূর্ণতম প্রকাশ। An avatārā is a descent of God into man and not an ascent of man into God, which is the case with the liberated soul. (Radhakrishnan—The Bhagavadgita)

আমাদের দেশের মানুষ মুক্তআত্মা পুরুষে খুসী নয়—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে জাগ্রত আত্মা মাঝে মাঝে সুপ্ত হয়ে পড়ে তার জাগরণেই যে মানুষের মহিমা এ সত্য সাধারণের মনে কোন বিশেষ সাড়া তোলে না। স্বয়ং ভগবান না জন্মালে আমাদের দুর্বল ভক্তিবাদী মন আশ্রয় পায় না। ফলে মানুষের মস্তব্য কতদূর যেতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের হলোনা—সংগে সংগে তাকে ভগবান বানিয়ে ফেলি আমরা।

চৈতন্যদেবও সাক্ষাৎ অবতার ভক্তদের চোখে। যখন অবতার শ্রীকৃষ্ণর জন্ম মানুষীপন্থাতিকে আশ্রয় করেনি তখন কি করে চৈতন্যের জন্মই বা সেই পন্থাতিতে হয়। তখন তাঁর জন্মের কাহিনীও গড়ে তোলা হলো যীশু বা শ্রীকৃষ্ণের মত। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা অংশে বলা হচ্ছে

চৌদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ শচীর দেহে কৃপের প্রকাশে॥
মিশ্র কহে শচী স্থানে দেখি আন রীত।
জ্যোতির্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত॥
যাঁহা তাঁহা সব লোক করেন সম্মান।

ঘরেতে পাঠায়্যা দেন বস্ত্র ধন ধান॥
শচী কহে মুঞি দেখোঁ আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্তি লোক সব যেন স্তুতি করে॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ময়ধাম মোর হৃদয় পশিল॥
আমার হৃদয় হতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়॥

টীকায় রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন—"নিজের আবির্ভাবের পূর্বে ভগবান প্রথমতঃ জ্যোতিরূপে অথবা যেইরূপে তিনি প্রকটিত হইবেন সেইরূপে স্বপ্নাদিযোগে পিতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন (যেমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময় হইয়াছিল;) অথবা পিতা স্বীয় হৃদয়ে জ্যোতিরূপ প্রবেশাদির কথা মাতার নিকট প্রকাশ করিলে তদুপলক্ষে শ্রীভগবান মাতার হৃদয়েও আবির্ভাব হয়েন (যেমন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময় হইয়াছিল।-শ্রীভাগবত ১০/২/১১-১৩) তখন হইতেই মাতার দেহে প্রাকৃত মাতার ন্যায় গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু পার্থক্য এই যে প্রাকৃত রমণীর গর্ভসঞ্চার হইল শুক্র-শোণিতের সংযোগের ফল কিন্তু যিনি ভগবানের মাতা তিনি শুদ্ধসত্ত্বময়ী, শুক্র শোণিতের সংযোগে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়না-ভগবান নিজেই তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া-মাতার চিত্তে স্বীয় গর্ভে সন্তানোৎপত্তির প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়া তাঁহার দেহে গর্ভবতীর লক্ষণ প্রকটিত করেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্যোতিরূপে প্রথমে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাহার পরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের হৃদয় হইতে শ্রীশচীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন (ইহা শচীমাতাও প্রথমে জানিতে পারেন নাই) তখন হইতেই শচীমাতার দেহে গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

এর পিছনে ভক্তদের আগ্রহ কাজ করেছে। নিজের নিজের গুরুকে অন্যের গুরুর চেয়ে বড় প্রমাণ করার জন্য জঘন্য প্রতিযোগিতা চলে শিষ্যদের মধ্যে-সেই প্রতিযোগিতার ফলে কার গুরু কত অলৌকিক কাজ করে, প্রকৃতির ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘনের ক্ষমতা কার কত বেশী, তা প্রমাণ করার জন্য ভক্তদের উর্বর মস্তিষ্ক নানা গল্পের সৃষ্টি করে। সেগুলিকে সত্য বলে চালাবার জন্য নানা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। যীশু, কৃষ্ণ, চৈতন্যের জন্মকাহিনীকে ঐ জাতীয় গল্পের উদাহরণ বলে ব্যবহার করা যেতে পারে। যত প্রাচীনই হোক, যত পবিত্রই হোক, ঐ গল্পগুলির মধ্যে যে মিথ্যা ছাড়া কিছু থাকা সম্ভব নয় এ কথা আজও যে প্রমাণ করতে হয়; তাতেই বোঝা যাচ্ছে ভক্তদের পিচ্ছিল কর্দমাক্ত মনে আগাছার শেকড় কতদূর গেছে।

ভক্তির আশ্রয় না পেলে মানুষের ধর্মবোধ বাঁচেনা একথা যেমন সত্য তেমনি শুধুমাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করলে ধর্মবোধের বিকৃতি অনিবার্য সেকথাও তেমনি সত্য। পুরুষ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব আত্মশক্তিতে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলো। ক্রিয়াকর্মের জালে ভারতবর্ষের মন তখন সম্পূর্ণভাবে বাঁধা পড়েছে। জ্ঞান ও প্রেমের বৃত্তিকে জাগ্রত করে আত্মোপলব্ধির পথে তিনি মানুষকে মুক্তির পথ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভক্তির কোন আশ্রয় তাঁর শিক্ষায় রইলো না। ফলে তাঁর ভক্তদের মধ্যে অচিরে এমন দিন এলো যখন বুদ্ধ দেবতা হলেন। তাঁর পূজার নিয়ম পদ্ধতি হিন্দু যাগযজ্ঞের রীতিনীতির চেয়ে সহজ হলো না। "বস্তুত বুদ্ধই যখন বৌদ্ধের ভক্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল হইয়াছিল। তিনি নাই কিন্তু তাঁহার নাম আছে।" (বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ-রবীন্দ্রনাথ) বৌদ্ধধর্মে এই প্রতিক্রিয়া এমন প্রবল হলো যে বিচার ও জ্ঞানের সবলতা অবশেষে কিছুমাত্র রইলোনা-

নামাবলী, মাদুলী, তাবিজের হাটে প্রেমধর্মের স্রোত শুকিয়ে গেল।

গুরুবাদের ধোঁয়া আজকের বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের মন থেকে কি ঘুচেছে। বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামীর জনৈক জীবনীকার লিখেছেন "আমরা তাঁহার জননীর নিকটে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে অতি আশ্চর্যকথা শ্রবণ করিয়াছি। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়াছেন যে বিজয় আমার অন্য লোকের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে নাই। সে যখন আমার গর্ভস্থ হয় তখন তাঁহার পিতা আমাতে বীর্যাধান করেন নাই। তিনি কেবল ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে আমার গর্ভসঞ্চার হউক। তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই আমি গর্ভধারণ করিয়াছিলাম।" বলাবাহুল্য এই ঘটনা আমরা সর্বৈবমিথ্যা বলে মনে করি। যথারীতি দৈহিক সংযোগের ফলে যে পুত্র হয় তার মানবত্ব ঐ রূপ জন্মের ফলে ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। তবু ভক্তদের ধারণা যে ভগবানের জন্মের জন্য কোন সংযোগের প্রয়োজন নেই। এই ধারণার মূল কোথায় তা সন্ধান করা শক্ত নয়।

মানবকল্যাণ যাদের কাছে ধর্মের প্রধান কথা নয়, নিরাসক্ত জীবনের মহৎ আদর্শ যাদের কাছে গৌণ তারাই আধ্যাত্মিক শক্তিকে বড় প্রমাণ করার জন্যে যান্ত্রিকভাবে সমস্ত রকম প্রাকৃতিক শক্তিকে অস্বীকার করেন। এই কারণেই ধর্মের নামে ক্ষুধা নিদ্রাকে জয় করার দৈহিক কৌশলের মাহাত্ম্য গাওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক জগতের সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করা হয়েছে যৌনসংযোগ বা যেকোন ধরণের যৌনপ্রবৃত্তিকে। এটা একটি মানসিক কমপ্লেক্স যেটাকে যুগ-যুগ ধরে লালন করা হয়েছে—ফলে নারীকে ঘৃণ্যজীব এবং আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের অন্তরায় বলে মনে করা হয়েছে। বাইরে তার দেবীত্ব ঘোষণা করে কাঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে কামিনী ত্যাগের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। ফলে নারীঘটিত সকল বিষয়েই ধর্মীয় পাণ্ডাদের ভয়, পাছে তাঁদের অন্তরের ছাইচাপা প্রবৃত্তির আগুন আবার জ্বলে ওঠে। এই ভীতিবিহ্বলতায় অর্থহীন উদ্ভট-গল্পের রচনা ধর্মনেতাদের জীবনকে কেন্দ্র করে। এদের পবিত্রতার ছদ্মমার্গ এতই যে প্রাকৃতিক ঘটনার অনিবার্যতাকেও এরা লৌকিক অথবা অপবিত্রতার ধারণায় বাতিল করতে কুণ্ঠিত হয় না। সত্য উপলব্ধির সঙ্গে সংসারে কারো বিরোধ থাকা সম্ভব নয় শেষ পর্যন্ত, কিন্তু অসত্য কাহিনী রচনার দ্বারা আধ্যাত্মিকতার পবিত্রতা প্রমাণ করতে গেলেই তার ফাঁক আপনি ধরা পড়ে কারণ চিত্তদৌর্বল্য ও স্নায়বিক বিকারের তা নিঃসংশয় প্রমাণ।

সোমেন বসু

'শিশিরকুমার ভাদুড়ী'

'আশ্বিনের' সমকালীনে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের লেখা নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ 'শিশির-কুমার ভাদুড়ী' মনোযোগ সহকারে পড়লাম। শিশিরকুমারের জীবনের শেষদিকে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আমাদের বহুবিধ আলোচনা হয়েছিল এবং তারই দৈনন্দিন রিপোর্ট ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশও করেছি। সেই কারণে আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ববর্তীকালের শিশিরকুমারের পরিচয় পাবার জন্য আমরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। সেদিক দিয়ে শ্রীরায়ের লেখা থেকে নতুন কিছু পাইনি, অবশ্য সামান্য কিছু সময়ের আলাপ থেকে নতুন কিছু পাবার আশাই অন্যায়।

প্রবন্ধটিতে শ্রীরায় শিশিরকুমারের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের

বক্তব্য নিবেদন করছি। ইংরেজ প্রসংগে শিশিরকুমারের বক্তব্য প্রায় হুবহু করেছেন শ্রীরায়। ঐ ধরণের মন্তব্য তিনি আমাদের কাছেও বহুবার করেছেন, কিন্তু সেইজন্যই ইংরেজ তাঁকে পেয়ে বসেছে এমন কথা বলা সমীচিন হবে না। ইংরেজ তাঁকে পায়নি পেয়ে যদি থাকেত ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করে সেক্সপীয়ার, নট তথা নাট্য পরিচালক হিসাবে তিনি কোনদিনই ইংরেজী নাটক বা নাটকারকে বাঙলা নাটক বা নাট্যকারের ওপরে ঠাঁই দেননি, (একমাত্র ব্যতি-ক্রম সেক্সপীয়ার), বরং বলেছেন—গিরিশচন্দ্র অতুলনীয়; তাঁর অন্ততঃ ৪০ খানি নাটক প্রথম শ্রেণীর। (আজকের শিক্ষিত স্বাজাত্যাভিমানী বাঙালীদের সামান্যতম ভগ্নাংশই একথা জোর করে বলতে পারবেন।) তিনি আরো বলেছেন পশ্চিমী কায়দার বক্স ষ্টেজ বাঙালী জিনিয়াসএর পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা স্বরূপ। বলেছেন (ও লিখেছেন), বাঙালা থিয়েটারের পূর্ণবিকাশ ঘটাতে হলে থিয়েটারকে যাত্রাইজড্ করা দরকার।

থিয়েটারের বিজাতীয়তা ঘোচাবার কথাই শুধু বলেন নি, চেষ্টাও করেছেন। তিনিই প্রথম থিয়েটারের সম্পূর্ণ দেশীয় নামকরণ করলেন, নাট্য মন্দির, মনোমোহন নাট্য মন্দির, রঙমহল, নবনাট্যমন্দির, শ্রীরঙ্গম। তাঁরই অনুসরণে থিয়েটারের নাম হয়েছে, নাট্য নিকেতন, বিশ্বরূপা। থিয়েটারের দিন অর্কেস্ট্রার জায়গায় নহবত বসানোর পরিকল্পনা তাঁর, থিয়েটারের আসন বাংলা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করার পরিকল্পনাও তাঁরই। বাংলা নাট্যশালার শিশিরকুমার যখন সত্য সত্যই নবদিগন্ত সৃষ্টি করেছেন তখন সেখানে যতদূর সম্ভব বাঙলী-য়ানার প্রচলন তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। নিজের সাজপোষাকেও। (অন্ততঃ আমাদের সঙ্গে পরিচয়কালে) তিনি ছিলেন পুরোপুরি বাঙালী—(ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর)।

এসত্ত্বেও যদি তাঁকে ইংরেজ পেয়েছে বলা হয় তা সেই একই দোষে ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠতম বাঙালী অতুলনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও অভিযুক্ত করতে হয়। কারণ, ওয়াকিবহাল মহল বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাদীক্ষা যতই ভারতীয় হোক তাঁর পোষাক যতই খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত হোক না কেন যুক্তিবাদী মনের গঠনের দিক থেকে তিনি পুরোপুরি ইংরেজ। আমাদের এই ললিত লবংগলতার দেশে তাঁর মত ঋজু মেরুদণ্ডওয়ালা লোক শুধু আকস্মিকই নন বিস্ময়ও বটে।।

বঙালী যে আজো গ্রেট হতে পারেনি তার প্রমাণ আমাদের আশেপাশে যত তত্র ছড়িয়ে আছে কাজেই সে সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়। তবে শিশিরকুমার বিশ্বাস করতেন, আমরাও অদূর ভবিষ্যতে গ্রেট হবো। অনাগত যে মহাপুরুষ আমাদের স্কন্ধস্থ ঘোচাবেন তাঁর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী তিনি আমাদের কাছে বার বার করেছেন।

বাঙালী সম্বন্ধে আর একটি উধৃতি দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছি—কোচরাত বাঙালী নয়ই; কিন্তু তিনশ বছর আগে ওরা জোর করে বাঙালী হয়ে গিয়েছিল। এখন ইচ্ছে করলেই কি আর বাঙালী নয় একথা প্রমাণ করতে পারবে। আচ্ছা, এমন দিন আবার কবে আসবে যে দিন সবাই বলবে—আমরাও বাঙালী হচ্ছি। আমার মন বলছে, সেদিন আসবেই বেশী দেরী নেই।

রবি মিত্র

স মা লো চ না

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য চার টাকা। প্রকাশক—ক্লাসিক প্রেস, ৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সবুজপত্রের মুখপত্রে বীরবল, ওরফে প্রমথ চৌধুরী, বলেছিলেন "সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।" আমাদের নিদ্রালু মনকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই প্রমথ চৌধুরী লেখনী ধারণ করেছিলেন, নিছক অবসর-বিনোদন বা মনোবিলাস হিসেবে তিনি সাহিত্য চর্চা করেন নি। এইজন্যেই তাঁর রচনায় ভাবালুতার আফিম নেই, আছে 'উইট্' বা তীক্ষ্ণধার রসিকতা, এবং যুক্তি। বীরবলের রচনা নিরুচ্ছাস, বাহুল্যমুক্ত, বুদ্ধিপ্রধান।

তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বলেই রবীন্দ্রপ্রতিভার বিরাটত্বে অভিভূত হয়ে আমরা প্রমথ প্রতিভার মহত্ব এবং বাংলা সাহিত্যের ওপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সম্বন্ধে যতটা অবহিত হওয়া উচিত ছিল ততটা পারিনি। এবং প্রমথ চৌধুরীর রচনায় বুদ্ধিপ্রধান সূক্ষ্মতা এত বেশী যে স্বাভাবিক কারণেই তাঁর পাঠক পাঠিকার সংখ্যা খুব বৃহৎ বা ব্যাপক নয়। কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে লেখক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর 'বুদ্ধিপ্রধানতা' সম্বন্ধে 'সাধারণ' পাঠক মহলে যে সশ্রদ্ধ ভীতির ভাব আছে সেটাও অনেকখানি অকারণ বাড়াবাড়ি, কতকাংশে অহেতুকও বটে। তাঁর রচনা যাঁরা পড়েননি এবং পড়েন না, তাঁরা জানেন না না পড়ে তাঁরা কি থেকে নিজেদের বঞ্চিত রেখেছেন। বীরবলী সাহিত্য পড়ে যে শুধু নিছক পাঠকরাই লাভবান হবেন তা নয়; লাভবান হবেন সাহিত্যরচয়িতারাও প্রচুর, কারণ রচনা-শৈলীর অনুসরণীয় মডেল বা আদর্শ হিসেবেও বীরবলের রচনাবলী অসামান্য, অতুলনীয়।

খুবই আনন্দের বিষয় আমাদের সাহিত্য-রসিক সমালোচকেরা প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীর দিকে মন দিয়েছেন, এবং প্রমথ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন আলোচ্যার ফলে পাঠকদের দৃষ্টি এদিকে ক্রমেই আরো বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে, যা বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্ত প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে অরুণ বাবুর বইখানা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের আসরে একটি বিশেষ স্থান পাবে বলে মনে হয়। বইটির রচনাভঙ্গী সহজ, সরল; পণ্ডিতসুলভ জটিলতা এতে নেই। প্রমথ চৌধুরীর অসামান্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখক অতিশয় আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

এ বইতে মোট দশটি প্রবন্ধ আছে: বীরবল, বীরবলের আত্মকথা, সবুজপত্র ও বাংলা সাহিত্যের মোহমুক্তি, বীরবলী গল্প, বীরবলী সনেট, বীরবলী গদ্যরীতি, বীরবলী প্রবন্ধরীতি, প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যাদর্শন, প্রমথ চৌধুরীর রূপচেতনা, এবং প্রমথ চৌধুরী ও উত্তরকাল। প্রবন্ধগুলি সহজপাঠ্য, ফুটনোট কন্টকিত নয়, এবং পাঠক পাঠিকাদের নিঃসন্দেহে প্রমথ-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

অজিতকৃষ্ণ বসু